**January 1** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153146835841891>)

শেষ হয়ে যাওয়া টুথপেষ্টের গলা টিপে টিপে যারা টুথপেষ্ট বের করতে পারে, তারা জীবন সংগ্রামে বাধার পাহাড় দেখে উল্টা পথে দৌড় দিতে জানে না। যে বাবা পেনশনের টাকা 'অপু দশ বিশ' দিয়ে, চল্লিশটা খরচের খাত থেকে একটা খাত বাছাই করে খরচ করে, সে বাবার সন্তানেরা নেশার গলিতে হারিয়ে যায় না। যে মা মাসের পর মাস ক্ষিধা নাই বলে, নিজের পেট খালি রেখে সন্তানদের খাওয়ায়, সেই মায়ের ফ্যামিলিতে ভাঙ্গন ধরে না। যে ছেলেটা টিউশনির বেতন পেয়ে, অসুস্থ বাবার জন্য ঔষধ কিনে বাড়ি ফিরে, সে ছেলে রাতভর ভিডিও গেমস খেলে সময় নষ্ট করে না। যে মেয়েটা টাকা বাচাতে লুকিয়ে লুকিয়ে দুই গ্লাস পানি খেয়ে, দুপুরের লাঞ্চ সেরে ফেলে, সেই মেয়েটা বাবা মায়ের অসহায়ত্বের দিকে আঙ্গুল তুলে কথা বলে না। যেই ফ্যামিলিতে অর্থের যত অভাব, সেই ফ্যামিলির বন্ধন তত অটুট।

.

একটা মিডেল ক্লাস ফ্যামিলির ভিত্তিই হলো- স্ট্রাগল আর সেক্রিফাইস। যেখানে বাবা হচ্ছে স্ট্রাগলের কিং আর মা হচ্ছে সেক্রিফাইসের কুইন। মায়ের বিয়ের দিন থেকেই শুরু হয় সেক্রিফাইসের শোভাযাত্রা। নিজের চাওয়া পাওয়াকে আলমারিতে লুকিয়ে রেখেই শুরু করে দেয় ফ্যামিলি গড়ায় অবিরাম সেক্রিফাইস। পরিবারে সন্তান আসলেই সেই সেক্রিফাইসের হার দশগুণ বেড়ে যায়। সেক্রিফাইসের আটভাগ চলে যায় সন্তানের পিছনে, এক ভাগ স্বামীর পিছনে আর একবার ফ্যামিলির পিছনে। বোকা মহিলা নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্য একভাগ সময়ও রাখে না। একজন মা- শিক্ষক হয়ে সন্তানকে পড়ায়, বাবুর্চি হয়ে রান্না করে, পার্সোনাল এসিস্টান্ট হয়ে সবকিছু ঠিকঠাক করে, বডিগার্ড হয়ে নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আগলে রাখে, ভালবাসা দিয়ে দুঃখ-কষ্ট দূর করে।

.

অন্যদিকে বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাবার স্ট্রাগলের পরিমাণ বাড়তে থাকে। রিটায়ার করা একজন বাবার পক্ষে সংসারের খরচ মিটানো, ছেলেমেয়েকে মানুষ করানো যে কত বড় সংগ্রাম সেটা বাবারাই শুধু বলতে পারে। মা হচ্ছেন বাবার এই স্ট্রাগলের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। মিডেল ক্লাসের মেয়েরা অর্ধেক জীবন সেক্রিফাইস করে বাপের ফ্যামিলিতে, বাকী অর্ধেক সেক্রিফাইস করে স্বামীর ফ্যামিলিতে। আর মিডেল ক্লাসের ছেলেরা ক্লাসমেট প্রেমিকার হাত ছেড়ে দিয়ে, এক বুক কষ্ট চেপে ধরে, নিজেকে স্টাবলিস্ট করার নেভার এন্ডিং যুদ্ধে নেমে পড়ে।

**December 23, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153131811086891>)

বিয়ের আধুনিক নাম- 'শো অফ'। এই শো-অফ একদিন করলে হবে না। ছেলের হলুদ, মেয়ের হলুদ, আকখ্ত, বিয়ে, বৌভাত, হাবিজাবি করতে করতে একই কাপলের চার পাঁচবার বিয়ে দিয়ে ফেললেও শো-অফ শেষ করা যাবে না। সবগুলা প্রোগ্রামে আলাদা ড্রেস, গোল্ডের অর্নামেন্টসের প্রদর্শনী করা লাগবে। হলুদে স্পেশাল ডান্স পার্টি করে ফেইসবুকে ভিডিও আপলোড করা লাগবে। সব প্রোগ্রামে ভিন্ন ভিন্ন পার্লারের প্যাকেজ, স্টেজের থিম, খাবারের মেনু, লাইটিং ওয়ালা ভেনু, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট হায়ার করা লাগবে।

.

বিয়েটা রোমান্টিক করতে, হোটেলের বাসর প্যাকেজ কিনতে হবে। প্লেনে করে হানিমুনে কক্সবাজার যেতে হবে। মিনিমাম দশটা ফটোগ্রাফি প্যাকেজ নেয়া লাগবে। প্রি ওয়েডিং, পোস্ট ওয়েডিং, ব্রাইডাল স্পেশাল, মিনি ভিডিও, এক্সক্লুসিভ বাসর শুট করার পরেও ডিফারেন্ট স্টাইলে ছবি তুলতে হবে। তবে আজকাল বিয়েতে ফটোগ্রাফি হয় না। বরং ফটোগ্রাফির মাঝে একটু আধটু সময় পাইলে বিয়ে হয়। এছাড়া ফটোগ্রাফির অনেক উপকারিতা আছে। এরা আমাদেরকে ডিসিপ্লিন শিখায়। লাইন ধরে একজনের পরে একজন আসার প্রাকটিক্যাল ক্লাস করায়। এখন ছেলের মামাতো ভাইয়ের খালাতো শালীর ছোট মেয়ে স্টেজে উঠবে। ক্লিক, ওকে ডান। নেক্সট। এরপর ছেলের জুতা চুরির ভিডিও শুট করা হবে। ছেলে রেডি, জুতা রেডি- লাইট, ক্যামেরা একশন।

.

তিন বছর চাকরি করেও, একটা বিশেষ দিনের কিছু বিশেষ মুহূর্ত ধরে রাখার খরচ যোগার করতে না পারলে, খরচ মিটানোর অন্য উপায় না খুঁজে, খরচ কমানোর উপায় খোঁজা উচিত। অথচ আমরা খরচ মিটানোর জন্য বাধ্য হয় লোণ নেই। সেজন্য, নতুন সংসারে আমাদের পদচারণ শুরু হয়ে ঋণের বোঝা নিয়ে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, খরচ করার এক হাজার একটা প্যাকেজ পাওয়া গেলেও, বিয়ের পরে নির্ভাবনায় সুখে শান্তিতে থাকার একটা প্যাকেজও পাওয়া যায় না। বিয়ের পরে শো-অফ করার কিচ্ছু বাকী থাকে না। তাই ঋণের চাপে জর্জরিত হয়ে মুখ লুকানোর জায়গা খুঁজে পায় না অনেকেই।

**October 9, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153014775791891>)

পাশ করার পরে একটা ছেলে ক্যারিয়ার স্টাবলিস্ট করার সময় যত খুশি সময় নিতে পারে। অথচ মেয়েদের পড়ালেখা শেষ করার আগেই বিয়ে দিয়ে দেয়। কেউ কেউ চাকরি শুরু করলেও, জোর করে বিয়ে দিয়ে দিবে। যে মেয়ে সারা জীবনে একটা থালা বাসনও ধোয়নি, সেই এক লাফে হয়ে গেলো রাঁধুনি। সার্টিফিকেটগুলো সুটকেসে বন্ধী রেখে রান্না ঘরে পেয়াজ কাটাতে বাধ্য হয়। বড় হবার স্বপ্নগুলো পেয়াজের ঝাঁজের সাথে মিশিয়ে চোখের কোনা দিয়ে, ফোটায় ফোটায় অশ্রু ফেলে। অথচ ছেলেদের চাইতে বেশি কষ্ট করে, অনেক অনেক বেশি সামাজিক বাধা অতিক্রম করে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। সারাজীবনের কষ্টের আউটপুট আসার আগেই ক্যারিয়ার শেষ। যে বৃক্ষ ফল দেয়ার কথা, সে বৃক্ষ কেটে, কাঠের আগুনে বারবিকিউ করা হচ্ছে।

.

মজার বিষয় হচ্ছে- বিয়ের পর চাকরি না করলেও সংসারের যত দায়িত্ব পালন করা লাগে, চাকরি করলে ঠিক ততগুলা দায়িত্ব পালন করার পরেও ডজন খানেক বেশি দায়িত্ব পালন করা লাগে। আর বাচ্চা কাচ্চা হইলেতো কথাই নাই। শুধু বাচ্চা পয়দা করা না, বাচ্চার ডায়পার পাল্টানো, গোসল করানো, বাচ্চার শরীর খারাপ হলে রাতভর জেগে থাকা- সব দায়িত্ব মায়ের। বাচ্চাকে ফেলে রেখে মা অফিস চলে যাচ্ছে- এইটা দেখে বাচ্চা যখন নন স্টপ কান্না শুরু করে দেয়, তখন বাচ্চাকে রেখে অফিসে যেতে মায়ের বুকে কি পরিমাণ হাহাকার হয় তা শুধু মায়েরাই জানে।

.

আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে -ফ্যামিলি জোর করে মেয়েকে বিয়ে দিবে কিন্তু সেই বিয়েতে কোন ঝামেলা হইলে, ফ্যামিলির কোন দোষ হয় না। দোষ হয় মেয়ের। ছেলের ক্যারেক্টার খারাপ হইলেও, মেয়ের দোষ। জামাইকে সংসার মুখি করতে না পারা মেয়ের দোষ। সংসার না টিকা, মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে না পারা, মেয়ের দোষ। শারীরিক মানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে, ডিভোর্স দিয়ে বাপের বাড়ি ফেরত আসতে বাধ্য হইলে, সকাল বিকাল বাবা-মায়ের খোটা শুনতে হয়। পদে পদে বুঝিয়ে দেয়া হয়, সে একটা বোজা। তার কারণে অন্য ভাই বোনদের ভালো বিয়ে হবে না।

এত কিছুর পরেও মেয়েরা থেমে থাকে না। এগিয়ে যাচ্ছে, আরো যাবে।

**October 4, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153007794126891>)

সকাল বেলা মিরপুর থেকে বাসে উঠলেন বসুন্ধরা যাবেন। বাসের ড্রাইভার খুবই ফাউল। দুই মিনিট পর পর যেখানে সেখানে বাস থামায় পনের-বিশ মিনিট ধরে বসে থাকে। মানুষের কত কাজ আছে - অফিস করবে, ক্লাসে যাবে, পরীক্ষা দিবে, কেউ আবার ডেটিং করবে। অথচ ড্রাইভার সবার টাইম নষ্ট করতেছে। এইভাবে চার-পাঁচবার বাস থামালে বাসের সব যাত্রী চিল্লাফাল্লা শুরু করে দিবে। দেরি হয়ে যাচ্ছে, হাতে একদম সময় নাই।

এই দুনিয়াতেও আপনি অল্প সময়ের জন্য আসছেন। আপনার হাতেও খুব বেশি সময় নাই । বাসের ড্রাইভার সময় নষ্ট করলে আপনার গায়ে লাগে। অথচ নিজের জীবনের ড্রাইভিং সীটে বসে নিজেই নিজের সময় নষ্ট করতেছেন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস আপনার লক্ষ্যের জন্য কাজ না করে, চেষ্টা না করে, আলতু ফালতু কাজে বসে বসে টাইম পার করতেছেন। একটুও খারাপ লাগে না। একটুও নিজের প্রতি চিল্লাচিল্লি করেন না। নিজের হেয়ালিপনার জন্য আক্ষেপও লাগে না।

আপনি কিন্তু এমন ছিলেন না। ছোট বেলায় স্কুলের পড়ালেখা, হোমওয়ার্ক সবই কিন্তু ঠিক সময়ে করে ফেলতেন। এখন কেন করতে পারতেছেন না? কারণ এখন আপনার পিছনে চিল্লাচিল্লি করার জন্য আপনার আম্মু নেই। নরমে গরমে বুঝিয়ে শুনিয়ে, কখনো আদরে, কখনো শাসন করে আপনার কাছ থেকে কেউ ডেইলির কাজ ডেইলি আদায় করে নেয় না। এখন আম্মুর চিল্লাফাল্লা নাই বলে আপনার কাজ ঠিক মত করা হয় না। লাইফের টার্গেট হাসিল করার জন্য, নিজেই নিজেকে আম্মুর মত শাসন করতে হবে। কখনো পিছায় পড়লে রাত জেগে এক্সট্রা পরিশ্রম করে কাজ আগায় রাখতে হবে। আপনার মত একই টার্গেটের মানুষদের খুঁজে বের করে তাদের সাথে একই বাসে উঠতে হবে। যাতে তাদের কাজ, তাদের গতি, তাদের চিন্তাভাবনা দেখে নিজের ভিতরে স্পৃহা জাগাতে পারেন। তাদের কাছ থেকে হেল্প পেতে পারেন। নিজের প্রয়োজন নিজে না বুঝলে, অন্য কেউ আদর করে গিলায় খাওয়াই দিবে না। আর ঘড়ির কাটাও থেমে থাকবে না। অযথা সময় নষ্ট করলে, জীবন সায়াহ্নে ডায়রির পাতায় শুধু আক্ষেপই থাকবে। অর্জন থাকবে না।

**September 20, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152987480386891>)

কোন একটা বিল্ডিং এ কয়টা রুম, কয়টা দরজা-জানালা থাকবে, সেটা নিয়ে একটা প্ল্যান বানানোর সাথে সাথে যদি কাজ শুরু করে না দেন, তাহলে কয়দিন পরে কি প্ল্যান করছিলেন সেটাই ভুলে যাবেন। ছয় মাস পরে হুট করে সেই বিল্ডিং এর কথা মনে পড়লে, নতুন আরেকটা প্ল্যান বানাবেন। এইভাবে ছয় মাস পর পর নতুন নতুন প্ল্যান বানানোর পরেও বিল্ডিং এর কাজে হাত না দিলে, একটা রুমও তৈরি হবে না। মাসে মাসে কাড়ি কাড়ি ভাড়ার টাকা কমানোর স্বপ্নও সফল হবে না। বরং বাড়ির ডিজাইন ফাইনাল করতে না পারলে, কোন আর্কিটেক্ট এর কাছে যান। আর্কিটেক্ট এর পিছনে টাকা খরচ করতে না চাইলে, রাজমিস্ত্রির কাছে যান। সেটাও না পারলে নিজে নিজে অন্য কোন বিল্ডিং এর মাপ-যোগ দেখে, যত দ্রুত সম্ভব প্ল্যানের চ্যাপ্টার ক্লোজ করে, ইট, বালি, সিমেন্ট দিয়ে বিল্ডিং বানানোর কাজ শুরু করে দেন। কাজ যত দ্রুত শুরু করে দিবেন, বিল্ডিং তত দ্রুত শেষ হবে। ভাড়ার টাকাও তত দ্রুত কামাইতে পারবেন। বিল্ডিং বানানোর কাজ শুরু না করে, খালি প্ল্যানের পর প্ল্যান বানাইতে থাকলে যেমন কোনদিনও ভাড়া পাবেন না। তেমনি আপনার স্বপ্নের পিছনে না ছুটে, একটার পর একটা প্ল্যান বানাইতে থাকলে আপনার স্বপ্ন কোনদিনও বাস্তবায়ন হবে না।

.

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমাদের স্বপ্নগুলো প্ল্যানের টেবিলেই মারা যায়। কোন একটা ড্রিমের পিছনে ছোটার জন্য দুই-এক লাইন প্ল্যান বানানোর পরে আমরা এত বেশি টায়ার্ড হয়ে যাই যে পরের ছয় মাস আর কোন খবর থাকে না। কোন একটা কাজ কিভাবে করবো সেটা নিয়ে কনফিউশন থাকার কারণে, কি করতে চাই সেটাই ভুলে যাই। একবার দুইবার না, বারবার ভুলে যাই। এই প্ল্যান আর ভুলে যাওয়ার দুষ্টু চক্র থেকে বের হইতে হইলে, যে লাইনে স্বপ্ন দেখতেছেন সে লাইনের আর্কিটেক্ট এর কাছে যান। আর্কিটেক্ট না পাইলে, কোন রকম গোঁজামিল দিয়ে সফল হইছে এমন কারো কাছে যান। সেটাও করতে না পারলে, অন্য কারো কাজের স্টাইল দেখে, লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটা আউটলাইন বানিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

.

মনে রাখবেন, বিল্ডিং এর ফাউন্ডেশন দেয়ার আগেই বিল্ডিং এর সব ইট বালি রড যেমন যোগাড় করে ফেলা লাগে না, তেমনি আপনার লক্ষ্যের কাজ শুরু করে দেয়ার আগে, সব কিছুর প্ল্যান পুঙ্খানুপুঙ্খ সেট করা লাগবে না। একটার পর একটা ইট দিয়ে বিল্ডিং বানাবেন আর এক স্টেপ এর পর আরেক স্টেপ পার করে লাইফের টার্গেট এচিভ করবেন। মাঝপথে সিচুয়েশন চেইঞ্জ হইলে, প্ল্যানও চেইঞ্জ করবেন। তবে টার্গেট এচিভ করতে হলে, অবজেক্টিভ ঠিক রেখে এক্টিভিটিস সর্বদা চালু রাখতে হবে।

**স্ট্রাগল টু বি কন্টিনিউড – ৯ August 30, 2015**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152944003696891>)

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে ট্রান্সফার হওয়ার দুই মাস পর থেকেই চাকরির জন্য এপ্লাই করা শুরু করে দিছিলাম। কিন্তু ইন্টারভিউতে কেউ ডাকতো না। দুই দিন পরে Resume তে "Bachelor in Industrial & Production Engineering" কে চেইঞ্জ করে "Bachelor in Engineering" করে দিলাম। নিজের একটা ওয়েবসাইট ([mmrkhan.webs.com](http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmmrkhan.webs.com%2F&h=jAQF2cTQRAQGah9aKs6CGjzVS8nNxNq6gX3CfHbGMYacV2Q&enc=AZP_RvUBwjgHbe923TSDOYdHMiCcgZo4r2QDAVt7vEp7-ktRrO2p4QCHPXLpdBBUqgUEZoiH-HCznfB-0JiFvWInjqBs-9a52LJUqkimn-xAkOVirD6jXt_s44JLP_H-dh4ds5_aY6TNsR365tS-ZD1WaF763xukte3sQCocGXOjDTZ5y-29iPU-9pCrmIGVuzE&s=1" \t "_blank)) বানালাম। তাতেও কোন লাভ হলো না।

.

কম্পিউটার সায়েন্সের প্রচুর জব আছে। কিন্তু ছোট বা মাঝারী সাইজের কোম্পানি, ইন্টারন্যাশনালদের স্পন্সর করতে চায় না। তাই রিক্রূটাররা আমাদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না। এই সুযোগ নিয়ে ইন্ডিয়ান কনসালটেন্সি ফার্মগুলা অন্য কোম্পানির নাম দিয়ে পপুলার জব-সাইটে ফেইক জব পোস্ট করে। তারপর ইন্টারন্যাশনালদের স্পন্সরের লোভ দেখাইয়া, চার-পাঁচ বছরের ফেইক এক্সপেরিয়েন্স যোগ কইরা অন্য কোম্পানিতে নিজেদের এমপ্লয়ী হিসেবে কাজ করায় এবং স্যালারীর ২৫-৩০% কমিশন খায়। আমি ভাবলাম- ওরা দুই নাম্বারী করতে পারলে, আমি অন্তত একটা ইলিউশান তৈরি করতে পারি। আগের কাজ, নিজের স্টার্টআপের প্রজেক্ট-গুলারে ঘুরাইয়া পেঁচাইয়া, জোর কইরা কম্পিউটার সাইন্সের কাজ হিসেবে দেখালাম। বাংলাদেশ থেকে চার বছর জব করে আসা জুনায়েদ ভাইয়ের LinkedIn প্রোফাইল থেকে- "4 years experience in full software development life-cycle" কপি পেস্ট মেরে আমার প্রোফাইলের সামারিতে দিয়া দিছিলাম। সাথে সাথেই ইন্টারভিউ কল বেড়ে গেছিলো। আবার এমনও দেখা গেছে, একই কোম্পানি থেকে জুনায়েদ ভাই ইন্টারভিউ পায় নাই অথচ আমি পেয়ে গেছি।

.

হাফ-ঝাপ মেরে ইন্টারভিউ পাওয়া গেলেও, চাকরি পাওয়া অত্ত সোজা না। trip Advisor এ এক ঘন্টার ফোন ইন্টারভিউ ছিলো। কয়েকবার চেষ্টা করেও প্রথম প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারি নাই। তাই পাঁচ মিনিট পরে- "I think we should stop here." বলে ফোন রেখে দিছিলো। লজ্জায় আর অসহায়ত্বে, বাসা থেকে বের হয়ে ইউনিভার্সিটি ভিলেজের পার্কিং লটে বসে বসে ঠিক করছিলাম- "এক্সপেরিয়েন্সের ইলিউশান ধরে রেখে, বার বার লজ্জায় পড়লে, স্বল্প সময়ে বেশি পরিশ্রম করার ক্ষিপ্ততা আসবে"। তাই যতবার এক ঘন্টার ইন্টারভিউ পাঁচ-দশ মিনিটে শেষ হইছিলো, ততবার নব্য উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। তবে সবচেয়ে কষ্টের অভিজ্ঞতা ছিলো, Douglas Scientific এর অফিসে। দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত পাঁচ রাউন্ড ইন্টারভিউ হওয়ার কথা ছিলো। প্রথমেই একটা ল্যাপটপে দুইটা সহজ প্রবলেম সলভ করতে এক ঘন্টা সময় দিয়ে বললো- চাইলে ইন্টারনেটও ব্যবহার করতে পারবে। কত্ত রকমে যে গুগল করছিলাম, আল্লাহ মালুম। তারপরেও একটা প্রবলেমও সলভ করতে পারি নাই। তাই পাঁচ রাউন্ড দূরে থাক, এক রাউন্ড শেষেই বলে দিছিলো- "বাপু বাড়ি যাও!"। এতটাই মন খারাপ হইছিলো যে, হাইওয়ের মাঝখানে গাড়ি থামিয়ে, বিস্তীর্ণ মাঠের ওপারের খোলা আকাশের দিকে অশ্রুভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ।

.

ইন্টারভিউতে যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম না, সেগুলার উত্তর মাইনসের পিছে ঘুরে ঘুরে, গুগলে সার্চ মেরে খুঁজে বের করতাম। ড্রপবক্সে Interview materials নামে একটা ফোল্ডারে সবকিছু রাখতাম। প্রোগ্রামিং এর অনেক কিছু আমার রুমের দেয়ালে ঝুলায় রাখতাম। একটা সাদা বোর্ড ছিলো, তাতে লিখে রাখতাম। কমন পড়লে, দেখে দেখে বলে দিতাম। আর নিজের কাছে জাস্টিফাই করার জন্য ভাবতাম- চাকরি পাইলে নিশ্চয়ই গুগল করে এনসার বের করে প্রোগ্রামিং করতে দিবে। তারপরেও ইন্টারভিউর পাঁচ-দশ মিনিট গেলেই ওরা বুঝে ফেলতো আমার প্রোগ্রামিং এর কনসেপ্ট ক্লিয়ার না। ২০১১ সালের মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মাইক্রোসফটে তিনবার, এমাজনে দুই বার, ইয়াহুতে দুইবার, LinkedIn এ একবার, ছোট খাটো খুচরা-খাচরা, আন্ডা-বাচ্চা শত শত কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিছিলাম। একটা ইন্টার্ন পাওয়া ছাড়া আর কোন সাকসেস ছিলো না।

.

কয়দিন পরে বুঝলাম ছোট বা মাঝারি কোম্পানির অলিখিত সিস্টেম হচ্ছে- অন্য শহর থেকে ক্যান্ডিডেট ইন্টারভিউর জন্য ফ্লাই করে আনবে না। তাই কোম্পানি যে শহরে, তার আশেপাশের ভার্সিটির ক্যারিয়ার সেন্টারে জব পোস্ট করে। ফারগো ছোট শহর বলে, নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির ক্যারিয়ার সেন্টারে জব কম আর বড় শহরের ভার্সিটিতে অথবা বড় বড় ভার্সিটিতে জব বেশি। এইটার জন্য আরেকটা বুদ্ধি বের করলাম। আমার যেসব ফ্রেন্ড কম্পিউটার সায়েন্সের না কিন্তু বড় ভার্সিটিতে বা বড় শহরের কোন ভার্সিটিতে পড়ে তাদের ক্যারিয়ার সেন্টারের ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ড নিয়ে, তাদের ভার্সিটির ক্যারিয়ার সেন্টারে যেসব কোম্পানি জব পোস্ট করছে, সেইসব কোম্পানির ওয়েবসাইটে গিয়ে ডাইরেক্ট এপ্লাই করতাম। এই সিস্টেমে ইন্টারভিউ পাওয়ার হার অনেক বেশি। ইনফ্যাক্ট আমার প্রথম চাকরি, স্ট্রাটা ডিসিশন টেকনোলজি এর খোজ এইভাবেই পাইছিলাম। ইন্টারভিউ দেয়ার আগে glassdoor বা careercup এ ওই কোম্পানির ইন্টারভিউর প্রশ্ন সবসময় দেখে যেতাম। শিকাগোতে অন-সাইট ইন্টারভিউতে গিয়ে দেখি glassdoor এর প্রশ্ন কমন পড়ে গেছে।

.

২০১১ এর ডিসেম্বরের ২৮ তারিখে স্ট্রাটা ডিসিশন টেকনোলজিতে জব পেয়ে যাই। জব পাওয়ার পরে প্রফেশনাল লেভেলে প্রোগ্রামিং করতে কি কি স্ট্রাগল করা লাগছিলো সেটা আরেকদিন বলবো।

**August 21, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152928090731891>)

আপনাদের হয়তো গাড়ি নাই, বাড়ি নাই, হাফ ডজন কাজের লোক নাই। তিন-চারটা টিউশনি করে সেমিস্টার ফী যোগান দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে ভাবতেছেন অন্যরা আপনার চাইতে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আসলে, অন্যরা আপনার চাইতে এগিয়ে যায় নাই। হয়তো আপনার বাপের চাইতে আরেকজনের বাপ এগিয়ে থাকতে পারে কিন্তু আপনার চাইতে আরেকজন এগিয়ে যায় নাই। শুনেন, ঘোড়ার রেইস লাগলে, কোনটা জমিদারের ঘোড়া আর কোনটা কৃষকের ঘোড়া, তাতে কিছু যায় আসে না। যে ঘোড়ার দম বেশি, পায়ে জোর বেশি, হর্স পাওয়ার বেশি, সে ঘোড়াই জয়ী হবে। তাই বাপের জোরে কে আপনার চাইতে কত মাইল আগায় আছে সেটা হিসাব করার কিচ্ছু নাই। আপনার পায়ে জোর থাকলে, বুকে সাহস রেখে দৌড় দিতে পারলে, অল্প কয়দিনেই অন্যরা পিছনে পড়ে যাবে। আজকে কে কোন লেভেলে আছে সেটা ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে, কালকে কে কোন লেভেলে থাকবে। কে কে নিজেকে দৌড়ের মধ্যে রেখে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারবে।

.

যাত্রা শুরু করতে গেলে আমাদের প্রথম সমস্যা হচ্ছে, রাস্তার ৯০ ভাগ ভালো জায়গা দেখেও, নিজেদের ভিতরে রাস্তায় নামার কনফিডেন্স তৈরি করতে পারি না। বরং বাকী ১০ ভাগের দুই চারটা গর্তে কে কবে পা দিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে ফেলছে, সেটা নিয়ে গবেষণা করতে করতে ছয় মাস পার করে দেই। হাত পা ঘুটিয়ে বসে থাকি মাগার রাস্তায় নামি না। আসলে, গর্তের সাইজ দেখে ভয় না পেয়ে, গর্তকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য যে যত বেশি পরিশ্রম করবে, যত বেশি চেষ্টা করবে, সে তত বেশি এগিয়ে যাবে, তত বেশি অসম্ভব কে সম্ভব করবে। আর আমি-আপনি সম্ভব জিনিসটাকে অসম্ভব ভেবে আঙ্গুল চুষতে চুষতে জীবন কাটিয়ে দিবো। শুনেন, রাত জেগে সাধনা করে কিছু অর্জন করার মজা আর নাক ডেকে ঘুমানোর মজা এক সাথে পাওয়া যাবে না। যে ছেলেটা প্রিমিয়াম লীগের খেলা বাদ দিয়ে, আড্ডা-ট্রলগিরি পাশ কাটিয়ে স্বপ্নের পিছনে সাধনা করে যাচ্ছে, সে তার সাধনার ফল পাবেই। আজকে একটু বেশি মাস্তি করতে গিয়ে, একটু বেশি রিলাক্স করতে গিয়ে, বাকি জীবনটাকে রিস্কের মধ্যে ফেলে দেয়া মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আজকের দিনটা আসলেই অনেক বড়। ২৪ ঘন্টা সময়। এই ২৪ ঘন্টার মধ্যে, দুই তিন-ঘন্টা আপনার ফিউচারের জন্য ইনভেস্ট না করলে, আপনার অবস্থান আপনা আপনি চেইঞ্জ হয়ে যাবে না। আজকের দিনটা চলে গেলে এই ২৪ ঘন্টার মধ্যে এক মিনিটও ফিরে পাবেন না। আপনি চাইলে, গতকালকে কিংবা আগের বছরে ফিরে গিয়ে এক মিনিট সময়ও আপনার ফিউচারের জন্য ইনভেস্ট করতে পারবেন না। ফিউচারে জন্য কিছু করতে চাইলে সেটার জন্য ইনভেস্ট আজকেই করতে হবে। ঘুরে দাড়াতে হলে, আজকেই ঘুরে দাড়াতে হবে। এখনই ঘুরে দাড়াতে হবে।

.

একা একা ঘুরে দাড়াতে না পারলে, কঠোর পরিশ্রমীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে, স্বপ্নবাজদের সাথে মিশতে হবে, তাদের ফলো করতে হবে। সঠিক সঙ্গ ম্যানেজ করতে পারলে, সঙ্গ দোষে লোহাকেও ভাসিয়ে দেয়া সম্ভব।

[July 11, 2015](https://web.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152846610176891)

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152846610176891>)

মধ্যম আয়ের দেশ হইতে গিয়ে- বড় লোক আরো বড় লোক হইছে, গরিব মানুষ আরো গরিব হইছে। কিন্তু বাটে পড়ে গেছে চাকরিজীবী মিডল ক্লাস। না পারে কারো কাছে হাত পাততে, না পারে খরচের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে। ছেলেটা আবার সরকারী ভার্সিটিতে চান্স পায় নাই, বাধ্য হয়ে প্রাইভেটে ভর্তি করাইছে। প্রত্যেক সেমিস্টারে ৬০ হাজার টাকা ফি দিতে দিতে খবর হয়ে যাচ্ছে। তাতে আবার সরকার বাহাদুর ১০ পার্সেন্ট ভাগ বসাইছে। খালিতো সেমিস্টার ফি না, ল্যাব ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি, মেসের ভাড়া, বই-খাতা, থাকা-খাওয়া, খরচের খাতের শেষ নাই। শুধু নতুন কোন ইনকামের রাস্তা নাই। খরচ যোগাড় করতে গিয়ে প্রেশারের ঔষধ কিনা কমিয়ে কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। বুকের ব্যথাটা বাড়লেও দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে থাকে, ঔষধ লাগবে না, ঠিক হয়ে যাবে বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। জানালা দিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে আর ভাবে পরের মাসের খরচটা কেমনে যে যোগাড় হবে?

.

তবে ফ্যামিলি মিডল ক্লাস হইলেও, ছেলেমেয়েগুলা কিন্তু আপার ক্লাস। পুরাই আপার ক্লাস। তাগো ল্যাপটপ লাগবে, স্মার্টফোন লাগবে, ব্রডব্যান্ডের ইন্টারনেট লাগবে, জন্মদিনে বন্ধুদের খাওয়াতে হবে, বান্দরবন ঘুরতে যাইতে হবে। কোন একটা জিনিস সময়মত জোগান দিতে না পারলে, মন খারাপ করবে, চিল্লাচিল্লি করবে, মান অভিমান করবে। তবুও বুঝতে চাইবে না সাড়ে উনিশ হাজার টাকার মাসিক বেতনটাকে হাজারবার পারমুটেশন কম্বিনেশন করলেও সংসার খরচ মিটিয়ে একটা স্মার্টফোন কিনার টাকা বের করা যায় না। সে কথা আবার ছেলেমেয়েগুলাকে বলা যায় না, বুঝানো যায় না, বুঝতেও চায় না। বাধ্য হয়ে চার বছর আগের পাঞ্জাবিটা দিয়েই ঈদের নামাজ পড়তে যায় মিডল ক্লাসের আব্বুরা। আর রান্না করতেছি, পরে গোসল করবো বলে পুরাণ শাড়ি পড়েই ঈদ কাটিয়ে দেয় মিডল ক্লাসের আম্মুরা।

[**June 20, 2015**](https://web.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152800813066891)

(https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152800813066891)

"তোর বাপ মসজিদের ইমাম ছিলো! তোর দাদা মাওলানা ছিলো! আর তুই মাইনসের জমিতে বদলা দেস। কামলা খাটছ। তুই জীবনে কোনদিন মেট্রিক পাস করতে পারলে, আমার এই বাম হাতে তালগাছ উঠবে।" - অন্যের জমিতে ধান কাটার সময় আরেক বদলার কাছ থেকে এই কথাগুলো শুনে, ছেলেটি মাথায় রক্ত উঠে গেলো। ধান কাটার কাস্তে ছুড়ে ফেলে, হাটা শুরু করলো পাশের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের দিকে। স্কুলের হেড মাস্টার ছেলেটিকে দেখে খুবই বিরক্ত- ১৬ বছরের কামলা পড়বে প্রাইমারি স্কুলে? হেডমাস্টার তো রাজি হবেই না কোন মতে। কয়েকদিন হেডমাস্টারের পিছনে ঘুরে কয়েকজনরে ধরে, শেষমেষ ১৬ বছরের ছেলেটি ভর্তি হলো ক্লাস ফোরে। খাওয়া খরচ বাঁচাতে অন্যের বাড়িতে লজিং থাকে। স্কুলের বই খাতার খরচ জোগাড় করতে মাঝে মাঝে দিনমজুরের কাজ বা পান সিগারেট ফেরি করে বিক্রি করে।

.

আরেকটু পিছনে ফিরে দেখলে- ছেলেটির দেড় বছর বয়সে মা মারা যায়। পড়ালেখায় মনোযোগ না থাকায় ৭ বছর বয়সে, সৎ মা বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বাধ্য হয়ে শহরে গিয়ে চা দোকানে কাজ করে। ১১ বছর বয়সে বাবা মারা যাওয়ার পরে গ্রামে ফিরে এসে কয়েক বছর দিন মজুরের কাজ করতে করতে একদিন জেদ ধরে ১৬ বছর বয়সে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়। একটা কঠিন জেদ কে পুঁজি নিয়ে সংগ্রাম করতে করতে একদিন ঠিকই মেট্রিক পাশ করেছিলো। মেট্রিক পাশ করে এলাকার চেয়ারম্যানের পরামর্শে ছাত্র জোগাড় করে গাছের নিচে বসে বসে পড়াতো আর ঔষধের ডিসপেনসারি থেকে আয় করে সংসার চালাতো। এভাবে কয়েক বছর চলার পর একটা বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল থেকে সরকারী স্কুল হয় আর বিয়ে করে ছেলেটিও বাবা হয়। ডিসপেনসারি, টিচার সংকটে একসাথে দুই তিন ক্লাস নেয়া, সংসার থাকলেও পড়ালেখা ছাড়েনি। দুইবার চেষ্টা করে ইন্টারমিডিয়েট, বেশ কয়েকবার ফেল করে ডিগ্রী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে বিএড শেষ করে।

.

প্রাইমারি স্কুলের টিচারগিরি, ডিসপেনসারি, নিজের পড়ালেখার পাশাপাশি পাঁচ সন্তানের ভরণ-পোষণ, ওদের পড়ালেখা, প্রাইভেট পড়ানো, জামা জুতা কিনে দিলেও নিজে শুধু স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরতো। মাসের পর মাস একই স্যান্ডেল পরার কারণে, স্যান্ডেলের ফিতার বল্টু ছিঁড়ে যেতো। এমন অনেকদিন হয়েছে- স্যান্ডেল হাতে বাসায় ফিরে আমাকে ডাকতেন, চেরাগটা নিয়ে আসতে। ছোট্ট আমি, দেশলাই দিয়ে চেরাগ জ্বালিয়ে নিয়ে আসতাম আব্বুর সামনে। আব্বু, ফিতার মাথা আর বল্টুর অংশ চেরাগের আগুনে ধরতেন। একটু নরম হয়ে আসলে, দুইটা এক সাথ করে দুই আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরতেন। ফিতার প্লাস্টিকের নরম অংশ প্রায়ই আব্বুর আঙ্গুলে লেগে গেলে সাথে সাথে সেটা মাটিতে মুছে ফেলতেন। পুনরায় গরম প্লাস্টিক আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে ধরতেন। কয়েকদিন পরে আবারও বল্টু ছিঁড়ে গেলে, স্যান্ডেল হাতে করে বাসায় ফিরতেন আর আমি চেরাগ নিয়ে আব্বুর সামনে বসে বসে দেখতাম। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই স্পঞ্জের স্যান্ডেল পড়তে থাকলে, যেখান দিয়ে ফিতার বল্টু নিচে চলে গেছে সেই জায়গার ছিদ্রটা একটু লুজ হয়ে যেতো। হাটতে হাটতে ফিতার বল্টু সহ ফিতাটা উঠে আসতো। এমন অনেক হয়েছে, রাস্তার মাঝখানে, স্কুলে এসেম্বলি ক্লাস নেয়ার সময়, এমনকি স্কুলে অডিটরদের সামনে আব্বুর স্যান্ডেলের লেইস ফিতা খুলে গেছে। স্যান্ডেলটা হাতে নিয়ে ফিতার বল্টুটা ঢুকিয়ে আবারো হাটতে শুরু করতেন আব্বু।

.

মাঝে মধ্যে টাকা পয়সার শর্ট পড়ে গেলে, আমাদেরকে বুঝতে দিতেন না। ক্লাস সেভেনের বার্ষিক পরীক্ষার সময় আমার বড় বোনের ভার্সিটির টাকা, মেঝো বোনের স্কুলের বেতন দেয়ার পরে আমার স্কুলের ফি দিতে পারতেছিলেন না। প্রথম পরীক্ষার সময় আমি হেডমাস্টারকে বলার পরে, স্পেশাল পারমিশনে ফার্স্ট পরীক্ষা দিছিলাম। কিন্তু সেকেন্ড পরীক্ষার সময়ও টাকা দিতে পারিনি বলে, কোন মতেই আমাকে পরীক্ষা দিতে দিবে না, স্কুল কর্তৃপক্ষ। একটু পরে পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে, আমি কানতে কানতে পাশের প্রাইমারী স্কুলে আব্বুর কাছে গেলাম। আব্বু আরো দুইজন টিচারের কাছে টাকা চাইলেন, কারো কাছে পেলেন না। আমকে দাড়াতে বলে, আব্বু দৌড় দিলেন বাজারের দিকে। কেনো জানি আমিও আব্বুর পিছনে পিছনে দৌড় দিলাম। বাজারে গিয়ে, যে দোকানে আগে দুধ বিক্রি করতাম, তার কাছে গিয়ে বললো- "ভাই, আমারে দুইশ টাকা দেন, ছেলের স্কুলের বেতন দিতে পারতেছি না।" আব্বুর চোখে পানি আসতেছিলো কিনা আমি খেয়াল করিনি। বাপ-বেটা দুইজনে দৌড় দিলাম স্কুলের দিকে, পরীক্ষা শুরু হবার বিশ মিনিট পরে স্কুলের ফি দিয়ে পরীক্ষা হলে ঢুকেছিলাম সেদিন।

.

এখন আর আমি আব্বুর সাথে একসাথে দৌড় দেই না। হাটিও না। একসাথে ধান ক্ষেতে আগাছা বাছতে যাই না। এমনকি একই রিক্সায় আব্বুকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাই না। কারণ আমি অনেক ব্যস্ত। টাকার পিছনে, চাকরির পিছনে, হায়ার স্টাডির পিছনে, হায়ার লাইফের পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ব্যস্ত। সপ্তায় দুই দিন ফোন করে - "ঔষধ খেয়ে নিও, ডাক্তার দেখায় নিও" বলে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে কিছু টাকা পাঠিয়ে দায় সারার চেষ্টা করি। আব্বুর সুস্থ থাকার জন্য কাড়ি কাড়ি ঔষধ লাগে না, শত শত ডাক্তার দেখাতে হয় না। ছেলেমেয়ে পাশে বসে থাকলেই চলে। ছেলেমেয়ের মুখ দেখতে পারলেই নব্বই পার্সেন্ট রোগ ভালো হয়ে যায়। কিন্তু এই নব্বই পার্সেন্ট ঔষধের সময় নাই, আব্বুর পাশে বসে গ্লাসে পানি ঢেলে নিজের হাতে খাইয়ে দেয়ার সুযোগ নাই। শুধু মাস শেষে দু-চার মিনিট ফোনে কথা বললে, আব্বু-আম্মুর সেক্রিফাইসের সিকি আনাও শোধ করা যাবে না। কোনদিনও না।

[**June 16, 2015**](https://web.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152790927131891)

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152790927131891>)

মিডল ক্লাসের সুখের সংজ্ঞায় দুইটা উপাদান থাকে- ভাঙ্গাচুরা হইলেও একটা গাড়ি, ছোটখাটো হইলেও নিজেদের একটা বাড়ি। কিন্তু বছরের পর বছর পার হয়ে গেলেও মিডল ক্লাসের চাকরির বেতন বাড়ে না। বাড়ি বা গাড়ি কোনটাই কিনতে পারে না। শেষমেশ আর কিছু না পেয়ে, ছেলে মেয়েরে মানুষ করার মাঝে জীবনের সফলতা খুঁজে। বাবা মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে, তিন বছরের বাচ্চাটা- এক বস্তা বই, কোচিং আর ভালো স্কুলে ভর্তির টেনশনে, নিঃশ্বাস নেয়ারও সময় পায় না। তাই তার বাবা অফিস থেকে ফিরে আসলে, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে না।

.

দয়া করে আপনার স্বপ্ন, আপনার বউয়ের ইচ্ছা আর পাশের বাড়ির ভাবীর ছেলের চাইতে বড় কিছু হবার প্রেসার কুকারে দুই দিনেই আপনার সন্তানকে সিদ্ধ করে ফেলবেন না। জীবনে বড় কিছু করতে চাইলে - ভালো স্কুলে চান্স পাইতে হবে, জিপিএ ভালো হইতে হবে এমনটা ভাববেন না। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হইলেও যে জীবনে সব পেয়ে যাবে, তা মনে করবেন না। আমার যে ফ্রেন্ডটা আমাদের সাথে এইচএসসি পাশ করতে পারেনি। পরেরবার পরীক্ষা দিয়েও সুবিধা করতে পারেনি। সে এখন কনস্ট্রাকশন ফার্মের মালিক। গোল্ডেন জিপিএ পাওয়া সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তার ফার্মে কাজ করে। ক্লাসের যে ছেলেটার জিপিএ তিনের নিচে ছিলো, সে এখন আম্রিকায় পিএইচডি করে। গ্রামের যে ছেলেটা ইংরেজি ঠিকমত বলতে পারেনা, ভালো ভার্সিটিতে চান্স পায়নি, টাকার অভাবে প্রাইভেটে ভর্তি হতে পারেনি। সেই ছেলেটা ন্যাশনাল ভার্সিটিতে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে রাত জেগে প্রোগ্রামিং শিখে এখন আউটসোর্সিং করে হাজার হাজার ডলার কামায়। আর ভালো ভার্সিটিতে চান্স পাওয়া ছেলেটা দুই বছর ধরে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

.

জিপিএ তিনের নিচে থাকলেই যে পিএইচডি করতে পারবে বা এইচএসসি ফেল করলেই যে কোম্পানি খুলে বসতে পারবে, তা কিন্তু না। আবার ভালো ভার্সিটিতে চান্স পাইলে, ক্লাস ফাইভে রোল নং এক হইলেই যে সফল হবে, তাও কিন্তু না। তবে সে ই সফল হবে যে- নিত্যদিনের সংগ্রামের সামনে বুক চেতিয়ে দাঁড়ানোর সাহস দেখাতে পারে। রাস্তা কঠিন আর অন্ধকার জেনেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। বার বার আছাড় খেয়ে হাত পা ভেঙ্গে ফেলার পরেও আবারো হাটার ইচ্ছা করে। সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়েও যে আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে পারে। রাত কতটা হয়েছে, কতটা পথ পাড়ি দিয়েছে তা হিসাব না করে, কতটা পথ আগাতে হবে তার জন্য না ঘুমিয়ে রাতভর শ্রম দিতে জানে। চেষ্টা আর সাধনা দিয়ে কোন একটা কিছুর পিছনে লেগে থাকতে পারে। সে জানে, লেগে থাকলে সফলতা আসবেই। আজ, না হয় আগামীকাল। এই লেভেলের আত্মপ্রত্যয়, এই লেভেলের সংগ্রাম আর সাহস, দশজন টিচার দিয়ে বইয়ের গোডাউনে বন্দি রাখলে তৈরি হবে না। বরং খোলা আকাশের নিচে উন্মুক্ত দুনিয়াতে একটু নির্দেশনা দিয়ে ছেড়ে দিলেই তৈরি হবে। তখনই সে জানবে, গর্তে পড়ে গেলে, কিভাবে বের হবার রাস্তা ম্যানেজ করতে হয়।

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152769488991891>)

**আজকে আমার এক বছরের এনিভার্সারি।**

বিয়ের না। ফেইসবুকে উঁচা লম্বা স্ট্যাটাস দেয়ার।   
"resume বা CV বানানোর এক ডজন টিপস" নামক গাম্বুইটকা মার্কা একটা লেখায় ২৫০ লাইক, ৪২ কমেন্ট আর ৫৬ শেয়ার দিয়ে যারা পাপ করেছেন, তাগরে গিয়া গালিগালাজ করেন। তাগো লাইগ্গাই গেলো এক বছর ধরে, আপনের টাইমলাইন দুষিত হচ্ছে। ১২২ টা লম্বু স্টেটাসে ৬৩,২৪৪ শব্দ লিখে।

.

সিরিজ টিরিজ তো দুরে থাক, প্রথম লেখার পরে যুতসই আরেকটা লেখা (প্রোকাস্টিনেশন কমানোর ৭ টা উপায়) খুঁজে পাইতে দুই মাস অপেক্ষা করা লাগছিলো। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি লেখা ভালোভাবে মাইর খাওয়ায় সেগুলারে প্রাইভেট করে ফেলছি, কিছু ডিলিটও করে দিছিলাম। তবে সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করছেন- রিচার্জ ইউরসেল্ফ, বারে বারে লাথি দিলে তালা ঠিকই ভাঙ্গবে এই দুইটা লেখায় লাইক/কমেন্ট/শেয়ার করে। আমি খুব ভালো করেই জানি ৫০% লোক না পড়েই লাইক মারে। ৩০% প্রথম প্যারাগ্রাফ পড়ে (See More বা Continue Reading এ ক্লিক না করেই) স্ক্রল করতে থাকে, ১০% লোক পড়লেও কারো কিছুতে কখনো লাইক বা কমেন্ট করে না। তবে একজন লোকও যদি আমার একটা লেখা পড়ে, তার জীবনটা নিয়ে এক মিনিট চিন্তা করে, আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর আশা করে, মনটাকে শক্ত করে মাথাটা উঁচু করে রাখে, নতুন আরেকটা স্বপ্ন দেখে, ভবিষ্যতটা নিজের মত করে নেয়ার আশা করে- আমার আর কি পাবার আছে?

.

এখন পিছন ফিরে তাকালে – গুরু নাম্বার, আর্ট অফ আতলামি, ফেইক লাভ গুরু, দেশের সাথে কথোপকথন, স্ট্রাগল টু বি কন্টিনিউড, আরও কত কি পাওয়া যাবে। মাইর খাওয়া দুই একটাও পাওয়া যাবে- হাউ টু সেইভ টাইম, ওয়ান লাইনার (এক দুই লাইনের স্ট্যাটাস), ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে, দুইটা জিনিস নিয়ে ভালোভাবে এখনো কাজ করতে পারিনি দেখে খুব আফসোস হচ্ছে – দেশের সাথে কথোপকথন, ল্যান্ড ইউর ড্রিম জব। র‍্যাপ গান আর স্ট্যান্ড আপ কমেডির হারিয়ে যাবে শীগ্রই। ট্রুথ এন্ড টিপস এবাউট আম্রিকা, আর্ট অফ আতলামি, ফেইক লাভ গুরু কেন জানি আটকে গেছে। গুরু নাম্বার, ইমেইলের রিপ্লাই (ইউ হ্যাভ টু ডু ইট), মোটিভেশনাল, ইয়াং পোলাপানদের সাইকোলজি, হাবলুদের জন্য প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনেক অনেক ইচ্ছা আছে।

.

আমার এক একটা লেখা অন্য আট দশটা স্ট্যাটাস এর মতই সাধারণ একটা স্ট্যাটাস। তবে আমার কাছে, মাথার ভিতর এক সপ্তাহ ধরে ঘুরতে থাকা একটা কনসেপ্ট যেটার ফ্লো আর স্টোরি ঠিক করতে গিয়ে জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলেছি মিনিমাম ৩ ঘন্টা। কখনো কখনো ৬-৭ ঘন্টা বা তারও বেশি। ভাগ্যিস বানান আর দাড়ি কমা নিয়ে চিন্তা করা লাগে না। নইলে জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাইত। আমার স্টাইলে ৫ মিনিটের একটা ভিডিও বানাতে গেলে কনসেপ্ট নিয়ে চিন্তা করে, অডিও রেকর্ড করে, ভিডিও এর জন্য পিকচার গুগলে সার্চ দিতে দিতে, সেগুলা নিয়ে ভিডিও বানিয়ে, ইউটিউবে আপলোড করে, ভিডিও এর কন্টেন্ট এর স্ক্রিপ্ট টাইপ করে সেটা আমার ওয়েবসাইট এ পাবলিশ করে, ৫০০০ স্টুডেন্টরে ইমেইল করতে সময় লাগে অলমোস্ট ২০-২৫ ঘন্টা। ইয়েস, মিনিমাম সলিড ২০ ঘন্টা। বিশ্বাস হচ্ছে না? একটা ভিডিও বানাতে বসেন, হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যাবেন। আমার ক্লোজ ফ্রেন্ডরা প্রায়ই জিগ্যেস করে, এতসব সময় ব্যয় করে, নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে আমার কি লাভ? সত্যি বলতে, আমার কি লাভ সেটা আমি নিজেই জানি না। অন্যদের কি বলবো। তবে এইসব হাবিজাবি করে, লোয়ার লেভেলের পোলাপানদের হেল্প করতে ভালো লাগে তাই করে যাচ্ছি। যতদিন ভালো লাগে করে যাবো।

.

জানিনা কতদূর যেতে পারবো। কতটা পথ আগাবো। তবে, যতটুকু পথই পাড়ি দেই না কেনো, সবাইকে নিয়েই একসাথেই পাড়ি দিবো।

**May 4, 2015 ইউ হ্যাভ টু ডু ইট – ৪** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152694175371891>)

ইমেইল -   
XXX ইউনিভার্সিটি তে আছি আমি...একটা কারনবশত তৃতীয় সেমিস্টারে ড্রপ খাই..২০১৩ এর শেষে। এর পর পড়া থেকে আমার মন উঠে যায়। জুনিয়রদের সাথে ক্লাস। পিছনের কিছু গ্যাপ সব মিলায়ে অসহ্য লাগে পড়তে। কোনও মতে আরেক সেমিস্টার পার করি কিন্তু এর পর আর পার করতে পারতেসি না...চরম GUILT কাজ করে। হতাশ লাগে। confidence নেগেটিভ এর ঘরে। কোনও মতে পড়া শুরু করলেও মাঝপথে হারায়ে জাইতেসি ... এইটা রিপিট হইতেসে কয়েক সেমিস্টার ধরে। ২ বছরের বেশি লস করে ফেলসি ... আমি ডিগ্রী টা পাইতে চাই কিন্তু পরতেও ভাল লাগে না । ভাল লাগ্লেও তা বেশি দিন ধরে রাখতে পারি না... কিভাবে কি করব বুঝতেসি না।

.

আমার উত্তর -

নিজের ভিতরে বেশি সিনিয়র ভাব চলে আসছে? শুনেন, আপনি আরো দুই সেমিস্টার ফেল করে যদি আরো দুই ব্যাচ নিচেও যান, সেই ব্যাচের পোলাপান, আপনার জুনিয়র না। আপনার সহপাঠী। আপনার বন্ধু। বুঝা গেছে? আপনার লেভেল নিচে নেমে ওদের সমান লেভেলে আসছে। কোনো আসছে? আপনার কারণে আসছে। সো, নিজের বর্তমান অবস্থা স্বীকার করে, নিজের ভিতর থেকে সিনিয়র গিরির ভূত তাড়াতে হবে। নইলে, এখনতো মাত্র ক্ষত লাগা শুরু হইছে, কয়দিন পরে, পইচ্যা গইল্যা গন্ধময় হইয়া যাইবেন গা।

.

আর আপনি সুপারস্টার হয়ে যান নাই যে, সবাই নিজে এসে আপনার সাথে দোস্ত হবে। বন্ধুগিরি আপনারেই শুরু করতে হবে। ক্লাসের পিছনে বসা যাবে না। আজকে থেকে সেকেন্ড বা ফার্স্ট বেঞ্চে বসবেন। ক্লাসের সবাইকে বলে দিবেন, ওরা জেনো, তুই বা নাম ধরে ডাকে। ক্লাসের যে কাজগুলি কেউ করতে চায় না, সেগুলা যেচে, নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে করতে হবে। যেমন, টিচার কোন নোট দিবে, সেটা ফটোকপি করে সবাইকে দেয়া, পিকনিকে যাওয়ার জন্য চাঁদা তোলা, বাস ঠিক করা। খেলাধুলা, আড্ডা দেয়া। ইচ্ছে করে, ওদের স্ট্যাটাসে লাইক-কমেন্ট করে ইন্টারাকশন বাড়াতে হবে।

.

নিজেরে লাজুক, ইন্ট্রোভার্ট মনে করা ছাড়েন। নচেৎ আপনার এখনকার guilty ফিলিংস বেড়ে রেগুলার ডিপ্রেশনের জন্ম হবে। এখনতো পড়তে ভালো লাগে না। দুইদিন পরে খাইতে ভালো লাগবে না। তিনদিন পরে কারো সাথে কথা বলতে ভালো লাগবে না। এইভাবে ছয় মাস চলতে থাকলে দেখবেন, আর বাচতে ইচ্ছে করবে না। কোন এক কারণে এক সেমিস্টার গেছে, সেটার আফসোসে বাকি লাইফ নষ্ট হবে। সো, জড়তা কাটিয়ে, ওদের সাথে মিশা শুরু করলে, দেখবেন সব আফসোস নাই হয়ে, অনেক মাস্তিতে ভার্সিটি লাইফ শেষ করে ফেলছেন। সেই মাস্তিময় লাইফের শুরু করতে হবে আজকেই, এই মুহূর্ত থেকেই।

April 9, 2015 ইউ হ্যাভ টু ডু ইট - ৩

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152644376046891>)

আরেকটা ইমেইল, যে সাবজেক্টে চান্স পাইছেন সেটা নিয়ে চুলকানি থাকলে পড়তে পারেন, "Vaia,I am from XXXX, IPE '10. Actually I can't walk with this subject. The managerial parts are very frustrating. I want to do my M.Sc in Aerospace engineering in USA. Now what should I do? Are the online courses in Edx or Coursera are enough for me to gain the attention of the professors?"

.

আমার উত্তর -   
শালার ব্যাটা, অন্য কোন সাবজেক্টে পইড়া ইমেইল করতে পারস নাই *grumpy emoticon* *upset emoticon* । ধরলাম ম্যানেজমেন্ট পার্ট আপনার ভালো লাগে না। এগুলা বিখাউজ। বাকি পার্টগুলা কি উল্টায়া আকাশে তুইল্লা ফেলাইছেন। না ফেলতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই? সেগুলা নিয়েতো আপনি ফ্রাস্ট্রেটেইট না। তাইলে, সেগুলার এই রকম হাল হইলো ক্যান? IPE এর মধ্যে মেকানিক্যাল এর অনেক কোর্স আছে, যেগুলা Aerospace engineering এর বেসিক কনসেপ্টে কাজে লাগতো, সেগুলাতে কি করছেন?

.

আসলে সমস্যা ম্যানেজমেন্ট পার্টের না। সমস্যা IPE এর না। সমস্যা হচ্ছে আপনার। সমস্যা হচ্ছে, আপনি এমন একটা স্বপ্ন দেখছেন যেটার স্বপ্ন দেখার যোগ্যতা আপনার নাই। আপনি ১০ ব্যাচের স্টুডেন্ট হইলে, গত ৪ বছরে আপনার পছন্দের সাবজেক্ট, Aerospace engineering নিয়ে কি করছেন?

.

শুনেন, আপনি কি হতে চান, কি স্বপ্ন দ্যাখেন, নো বডি কেয়ার্স। কেউ এক টুকরা গু ও দিবে না (no one gives a piece of shit)। সবাই কেয়ার করে, আপনি কি এচিভ করতে পারছেন। দুইটা ভিডিও দেখলে, অনলাইনে একটা কোর্স করলে আপনার যোগ্যতার প্রমাণ হয় না। বরং আপনার পছন্দের টপিক নিয়ে প্রজেক্ট করতে হবে। কয়টা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে টপ লেভেলে যাইতে পারছেন? কয়টা টপিক নিয়ে রিসার্চ করে আর্টিকেল লিখতে পারছেন যা দেখে ওই প্রফেসর বুঝবে আপনার ভিত্রে জিনিস আছে? সেটা করতে পারলে, সে প্রফেসরই আপনারে খুঁজে বের করবে। তখন IPE না ইতিহাসে সাবজেক্টে পড়ছেন মেটার করবে না। একটা পুরস্কার জিতে আসেন, দেখবেন IPE এর কোর্স টিচার, আপনার পছন্দের টপিক নিয়ে ক্লাস প্রজেক্ট করতে দিবে। কিছু এচিভ করে নিজেকে প্রুভ করতে না পারলে, কথা বলার আগেই ক্লাস টিচার আপনার আইডিয়া ফু মেরে উড়ায় দিবে। আসলে, you have to prove your passion by your achievement, not by empty dreams.

.

আর ম্যানেজমেন্ট পার্ট আপনার ভালো লাগে নাই। কারণ, ম্যানেজমেন্ট পার্ট, সঠিক এঙ্গেল থেকে দেখার ট্রাই করেন নাই। ম্যনেজমেন্ট পার্টে কি পড়ায়? প্রজেক্ট ম্যানজেমেন্ট, কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের কনসেপ্ট গুলা যদি Aerospace engineering এর পার্সপেক্টিভে, একটা স্পেসশীপ/রকেট বানানোর পার্সপেক্টিভে দেখে দেখে বুঝার চেষ্টা করলে সাবজেক্ট সম্পর্কে আপনার ধারণা ডিফারেন্ট হতে পারতো। তখন স্যাটেলাইট বানানোর স্কেজুলিং, শটেস্ট ফিনিশিং টাইম বা স্পেসক্রাফটের কোয়ালিটি মেইনটেইন কারার টেকনিক ফ্রাস্ট্রেটিং না লেগে, মজার আর উপভোগ্য হতে পারতো। আসলে সাবজেক্টে সমস্যা না, সমস্যা হচ্ছে ইচ্ছা আর দৃষ্টিভঙ্গিতে। দৃষ্টিভঙ্গি বদলান, স্বপ্নের জন্য সাধনা চালান, জীবন বদলে যাবে।

April 4, 2015 স্ট্রাগল টু বি কন্টিনিউড - ৮

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152633878041891>)

ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তে নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার্স বাদ দিয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়া শুরু করার দেড় মাসের মধ্যে, Clear Water Analytics এর ইন্টারভিউতে অনেকের সাথে আমিও কল পাই। ইচ্ছে করেই বিকেলের টাইম স্লট নিছিলাম যাতে অন্যদেরকে কাছ থেকে আগেভাগে প্রশ্ন জানা যায়। কিছু প্রশ্ন কমন পড়ছে আর বাকিগুলা আন্দাজে মেরে, সেকেন্ড রাউন্ডে ফোন ইন্টারভিউর জন্য সিলেক্টেডও হইছিলাম।

---

প্রোগ্রামিং এর ফোন ইন্টারভিউতে, সাধারণত ফোনে উত্তর বলার সাথে সাথে লাইভ কোড লেখা লাগে। যাতে ওরা দেখতে পারে আপনি কোডিং করতে পারেন কিনা। প্রথমেই, একটা সেন্টেন্স কে উল্টানোর (ডান থেকে বামে লিখার) প্রোগ্রাম করতে বলছিলো। অর্থাৎ ইনপুট হিসেবে, "I am a good boy" দিলে, আউটপুট দিবে -"yob doog a ma I" এইটা কেমনে করতে হয় আমি জানতাম না। তিন চার মিনিট গাইগুই করতে করতে গুগলে সার্চ দিয়ে যে উত্তর পাইছি সেটা বলতে বা লিখতে পারি নাই। অগত্যা বললাম "সরি, আমি এইটা পারতেছি না। আর কোন প্রশ্ন আছে?" তারপরে আরেকটা প্রশ্ন জিগ্যেস করেছিলো। ওইটার উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য গুগলে কি লিখে সার্চ দিতে হবে সেটাই বুঝতে পারতেছিলাম না। শেষমেষ আর কোন উপায় না থাকায় বললাম -"সরি, এইটাও মনে হয় পারবো না। আর কোনো প্রশ্ন আছে?" ওরা বললো, "আর কোন প্রশ্ন নাই"। ব্যস, সাত মিনিটেই শেষ হয়ে যায় জীবনের ফার্স্ট লাইভ কোডিং ইন্টারভিউ।

---

মোটামুটি সব ইন্টারভিউতেই একই কন্ডিশন হতো। তবে, পরের দিন ফোন করে বলতাম আমার এক্সাম ছিলো, হাবিজাবি, আমারে আরেকবার চান্স দাও। কয়েকজন আরেকবার চান্স দেয়ার পরে সেকেন্ড টাইমেও বাম্বু খাইছিলাম। তবে যে যে প্রশ্ন করতো সেগুলা আমি একটা খাতায় লিখে রাখতাম। সেগুলা সলভ করার জন্য গুগল করতাম। দেশী-বিদেশী, সিনিয়র-জুনিয়র, ফ্যাকাল্টি-চাকরিজীবী যারে যেখানে চান্স পাইতাম সেখানেই প্রশ্নগুলার উত্তর দিতে বলতাম। নতুন ইন্টারভিউ আসলে আগের প্রশ্নগুলা রিভাইজ দিতাম। এর মধ্যে ImageTrend এ প্রথম ফোন ইন্টারভিউ খারাপ হইছিলো। ফোন করে আবার ইন্টারভিউ সেট করছিলাম। সেকেন্ডবার ইন্টারভিউ একটু কম খারাপ হওয়ায়, তাদের অফিসে গিয়ে সামনা-সামনি ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য ডেকেছিলো।

---

প্রায় ২৫০ মাইল দূরে ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার জন্য বাস বা ট্রেনের সিস্টেম নাই। একমাত্র উপায় হচ্ছে গাড়ি রেন্ট করে ড্রাইভ করা। এর আগে কখনোই হাইওয়েতে গাড়ি চালাইনি বলে অনেক অনেক ভয় পাইছিলাম। ব্যাঙ্কে আমার হাজার খানেক ডলার ছিলো। সেটাই অরেকজনের নামে চেক লিখে সাথে একটা নোট রেখেছিলাম আমার ড্রয়ারে, "ভাই, আমার কিছু হয়ে গেলে, এই টাকাটা আমার ফ্যামিলিকে দিয়ে দিয়েন"। হাইওয়েতে উঠে গাড়ি চালানোর চাইতে বড় সমস্যা হইছিলো জিপিএস ধরে রাখা। জিপিএস গাড়ির গ্লাসে আটকিয়ে রাখা যায় সেটাই জানতাম না। এই জিপিএস দেখতে গিয়ে ফ্লাইওভারের সাইডে গাড়ি উঠায় দিছিলাম। আল্লাহ মাফ করছিলো। হালকা ঘষা খাইছিলো মাত্র। কত যে হর্ন খাইছিলাম, বেশ কয়েকবার ওয়ান ওয়ে রাস্তায় উল্টা দিক থেকে ঢুকে পড়েছিলাম, সাত আটবার হাইওয়েতে ভুল এক্সিট নিয়ে ফেলছিলাম।

---

আমি ছাড়াও আরো কয়েকজন ভারতীয় ImageTrend এর অফিসে গিয়ে সামনা সামনি ইন্টারভিউ দিছিলো। এর মধ্যে আমার দুইটা গ্রুপ প্রজেক্টের যে ৮০% কাজ করতো সেও ছিলো। বাকি ১৫% কাজ করতো অন্য দুই গ্রুপ মেম্বার। আমি খালি ইমেইল দিতাম, গ্রুপ মিটিং সেট করতাম আর হা করে বসে থাকতাম। মাথায় কিচ্ছু না ঢুকলেও মিটিং মিস করতাম না। মিনিয়াপোলিস যাওয়ার আগে অনেকগুলা ইন্টারভিউ প্রশ্নের উত্তর কয়েকটা সিডি তে রাইট করে নিছিলাম। ড্রাইভিং করার সময় গান না শুনে সেই সিডি কয়েকবার রিভাইজ দিছিলাম। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, আমাদের গ্রুপে যে ৮০% কাজ করে, যে আমার চাইতে দুইশগুণ ভালো প্রোগামিং পারে, তার ইন্টার্ন হয় নাই, আমার হইছে। দুনিয়া আসলেই বড় অদ্ভুত।

---

ইন্টার্ন করতে যাওয়ার সময়ও আমার গাড়ি ছিলো না। এক চাইনিজের গাড়ি ড্রাইভ করে মিনিয়াপোলিস গেছিলাম। যার বাসা তিন মাসের জন্য রেন্ট করছিলাম তার এক্সট্রা একটা গাড়ি ছিলো। তাকে কনভিন্স করছিলাম তার গাড়ি চালায় ৫ মিনিট ড্রাইভিং দূরত্বে অফিসে যাবো আর আসবো। তাকে ডেইলি ১০ ডলার করে দিবো। কয়দিন পরে তার যে গাড়িটা সে চালাতো সেটা নষ্ট হয়ে গেছিলো। এখন এই গাড়িটা তার লাগবে। বিকল্প পন্থা হিসেবে তার সাইকেল নিয়ে যাওয়া আসা শুরু করছিলাম। সেটাও একদিন রাস্তার মাঝখানে নষ্ট হয়ে গেছিলো। তারপর থেকে দৈনিক ৫০ মিনিট হেটে অফিসে যাইতাম, ৫০ মিনিট হেটে ফেরত আসতাম। ছোট ছোট পাহাড়ের মতো উঁচু নিচু রাস্তার সাইডে হাটার জন্য লেন ছিলো না। কানের কাছ দিয়ে শো শো করে গাড়িগুলো চলে যেতো। ইন্টার্ন শেষ হবার তিন সপ্তাহ আগে ইন্টার্নের ১,৭৫০ ডলার দিয়ে একটা ৯৫ সালের টয়োটা ক্যামরি কিনেছিলাম।

----

অফিস যাওয়া আসার চাইতেও বড় সমস্যা ছিলো প্রফেশনাল লেভেলে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ করা। ইন্টার্নের আগে html, css, javascript কয়েকটা টিউটরিয়াল দেখলেও, কাজ করার জন্য যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো না। কোন একটা কাজ দুই তিনবার বুঝায় দেয়ার পরেও উল্টাপাল্টা করে ফেলতাম। আমার কোড রিভিউ করে ফিডব্যাক দিলেও, সেটা ঠিক মতো কারেকশন করতে পারতাম না। সবার আগে আগে সকাল ৭টায় যাইতাম। সারাদিন গুগলরে গুঁতাই গুঁতাই অন্য ইন্টার্নদের অর্ধেকের সমান কাজও করতে পারতাম না। এর ওর পিছু পিছু ঘুরে, কিছু বুঝে - কিছু না বুঝে, উইকেন্ডেও একা একাই অফিসে সাধনা চালাতে থাকলাম। ইন্টার্ন শেষের দিকে ওদেরকে বলছিলাম ফুল টাইম হিসেবে হায়ার করতে, সঙ্গত কারণেই ওরা না করে দিছিলো। তাই সামার শেষে ফিরে আসতে হয়েছিলো নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে।

March 7, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152578746236891>)

আমাদের জীবনগুলো বেড়ে উঠে কিছু প্রি-ডিফাইন্ড ফর্মুলা, কিছু মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে। বাবা মা শিখিয়ে দিয়েছে, ভালো স্কুলে ভর্তি হলে, পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেলে, জীবন সফল হয়ে যাবে। কিছুদিন পরে সেটা চেইঞ্জ করে, ভালো ভার্সিটিতে চান্স পাইলে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হইলে, লাইফে আর কিছু করা লাগবে না। তারপরে আসে, মাল্টি -ন্যাশনালে চাকরি, আট ঘন্টার জায়গায় ১২ ঘন্টা গাধা খাটুনি, উইকেন্ডের দিনগুলিতে কাঁচাবাজার আর বিয়ের দাওয়াতে দৌড়াদৌড়ি। আর পুরো জীবনটার উপ্রে, একটা মুখোশ বসিয়ে দিয়ে, খুব আয়েশ করে বলি, "এই বেশ ভালো আছি"

.

আসলেই কি ভালো আছি? নিজের সখ, ছোটবেলার স্বপ্ন, ভালো লাগার জিনিসগুলো, তারা কি ভালো আছে? না ভালো নেই। ধূলো মুছে প্রিয় গিটারের তারগুলি ছুঁয়ে দেখিনি মাসের পর মাস, কেজি দরে বিক্রি করে দিয়েছি ছোটবেলার কবিতার খাতা, কতদিন খেলতে যায়নি প্রিয় খেলা, শিখতে গিয়ে মাঝ পথেই ছেড়ে দিয়েছি ক্লাসিক্যাল ড্যান্স। কেনো জানি রুটিন আর যান্ত্রিকতায় হারিয়ে গেছে সব ভালো লাগা, উপভোগ করা। চাইলেই আমরা ফেলে আসা জীবনে ফিরে গিয়ে আরেকটু বেশি এনজয় করতে পারি না। তবে, চাইলেই জীবনের বাকি দিনগুলাকে আরো আনন্দময় করে তুলতে পারি। এখন যে আফসোস করছি, আরো পাঁচ-দশ বছর পরে, পিছনে তাকিয়ে, সেই একই আফসোস করাটা বন্ধ করতে পারি।

.

আমাদের সমস্যা হচ্ছে, যে পথটা অন্যকেউ দেখায় দেয়, সেটা ছাড়া অন্য কোন পথ দেখি না। কেনো জানি দেখতেও চাই না। ঐটাই সহজ পথ মনে হয়। সহজ ভেবে, একই পথে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু একটু ভেবে দেখিনি, এই পথটাতেই কি আমি হাটতে চেয়েছি? এই চাকুরীটাই কি আমি করতে চেয়েছি? এই সাবজেক্ট টাই কি আমি পড়তে চেয়েছি? কোন পথে, পথের টানে না থেকে, মোহের টানে থাকলে, পথ একদিন না একদিন অন্য কোন অপশনরে কাছে টেনে নিয়ে, আপনারে টাটা বাই বাই করে দিবে। পথ থেকে ছিটকে, অথৈ সাগরে পড়তে সময় লাগবে না। সঙ্গী হিসেবে পাবেন দুর্বিষহতা আর হতাশা। তাই, কোন পথে যেতে হলে, হয় ওই পথটাকে এনজয় করার উপায় খুঁজে বের করেন, না হয় নতুন পথের সন্ধানে একটু ডানে-বামে, সপ্তাহে এক-দুই ঘন্টা চেষ্টা করেন। এভাবে লেগে থাকলে, গহিন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হলেও, আজকে না হয় কালকে, নতুন আরেকটা সহজ পথ তৈরী হবে, যা আপনাকে আনন্দ দিবে, অন্যদের আলো দেখাবে। হয়তো টাকা কম থাকবে, সোশ্যাল স্ট্যাটাস কম হবে, কিন্তু একটা পরিতৃপ্তি আসবে।

February 28, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152566352876891>)

টেবিলের উপর একটা কলা পড়ে ছিলো। দৌড় দিয়ে এসে, দুইজন লোক একই সময়ে, কলাটা নিতে গিয়ে, কে নিবে আর কি নিবে না, সেটা নিয়ে হাতাহাতি, মারামারি লেগে, অনেক ঝগড়া ঝাটির পরে, শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হইলো, কলাটাকে দুইভাগ করে, দুইজনেই অর্ধেক অর্ধেক নিবে। একদম ন্যায়বিচার হইছে মনে হয়।

অথচ, একজন আরেকজনকে জিগ্যেস করেনি, "ভাই আপনি কলাটা দিয়া কি করবেন?" যদি জিগ্যেস করতো, তাইলে, দুজনেই পুরো কলাটা ভোগ করতে পারতো। কারণ, একজন কলাটা খেতে চাচ্ছিলো। আরেকজন চাচ্ছিলো তার ছাগলরে খোসাটা খাওয়াবে। সো, যখন কারো সাথে কনফ্লিক্ট লাগবে, তখন নিজের পাশ থেকে ঘটনাটা না দেখে, অন্যজন কি চাচ্ছে, কেনো চাচ্ছে, তার কি পুরোটাই দরকার, তার কি এখনই দরকার। এই গুলো, জানার চেষ্টা করতে হবে। তাইলে কনফ্লিক্ট রিজলভ করা অনেক ইজী হয়ে যাবে এবং আপনি অনেক বেশি অর্জন করতে পারবেন।

-----

উনিশ শতকের মাঝামাঝি, সবে মাত্র রঙিন সিনেমা বানানো শুরু হইছে, তখনকার, একটা মুভিতে, একটা মদের ব্র্যান্ড দেখিয়ে অনেকগুলা দৃশ্য শুটিং করে, এডিট করার পর, প্রযোজক সাহেবের মনে পড়লো, ওই কোম্পানির কাছ থেকে, তাদের ব্র্যান্ড ব্যবহার করার অনুমতি নেয়া হয়নি। এখন ওই মদের কোম্পানি, মুভির বিরুদ্ধে মামলা করে দিলে, খবর আছে। মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। পরিচালক, প্রযোজক সবার মাথায় হাত। এখন নতুন করে শুটিং করা সম্ভব না। শেষপর্যন্ত বুদ্ধি বের করে, ফোন দিলো ওই কোম্পানিরে, "Excellent opportunity for your brand to have worldwide promotion in the biggest movie of the year. Are you willing to grab this only for this amount?" পরে আরো দুই তিনটা মিটিং করে, মিডিয়াম একটা এমাউন্ট স্পন্সর নিয়ে আসছে, ওই কোম্পানি থেকে। এর পর থেকেই শুরু হইছে, মুভির ভিতরের দৃশ্যের জন্য স্পন্সর।

কনফ্লিক্ট রিজলভ করতে গেলে বা নিগোচিয়েশনের সময়, আপনি ভালো অবস্থানে থাকতে নাও পারেন। কিন্ত আপনার দুর্বল কন্ডিশন প্রকাশ না করে, তাদের জন্য সম্ভাবনার দিকগুলো দেখাতে হবে। নাইলে আপনারে পেয়ে বসবে। ধরেন, আপনার যে কোন মূল্যে, একটা চাকরি দরকার। সেক্ষেত্রে, আপনি বেতন, বোনাস বাড়াতে বলবেন? অবশ্যই বলবেন, কিভাবে বলবেন সেটার টেকনিক, গুগলে সার্চ দিলেই পাবেন।

----

এক কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, বিড করে কাজ পাইছে, তারপর অনেক অনেক প্ল্যানিং, লোক হায়ার করার পর, পরের সপ্তাহে কাজ শুরু করবে, এমন অবস্থায়, যার কাছ থেকে কাজ পাইছে, সে এসে বল্লো, "কাজ শুরু করবা ভালো কথা। যেই টাইমের মধ্যে শেষ করবা বলেছ, সেই টাইমে শেষ করতে না পারলে, ৩০% পেনাল্টি" এইটা শুনে কনস্ট্রাকশন কোম্পানির মাথায় বাজ পড়লো। অলরেডি অনেক সময় ও টাকা খরচ করে এতদূর চলে আসছে। এখন কাজ ছাড়লে পুরাই পথে বসতে হবে। তখন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি বললো, "শর্ত মঞ্জুর। আমরা ডেডলাইন মিস করলে ৩০% টাকা পেনাল্টি দিবো। তবে, যদি আমরা ডেডলাইনের ১০ দিন আগে শেষ করতে পারি, তুমি আমাদের ২০% বকশিস দিবা"

অনেক সময় দেখা যায়, কেউ কেউ মাঝপথে এসে বেঁকে বসে। নিত্য নতুন শর্ত দেয়। বা ডিসকাশনের মধ্যে ডেডলক সেট করে। যারা প্রেম করে, তাদের কাছ থেকে উদাহরণ চাইতে পারেন। এইসব শর্ত দেবার কারণ হচ্ছে, ভয়, আস্থার অভাব। আপনি তখন যদি ওভার কনফিডেন্স না দেখান। প্রজেক্টটা কন্ট্রোলে আছে, বুঝাতে না পারেন, আপনি টিকে থাকতে পারবেন না।

February 22, 2015 স্ট্রাগল, টু বি কন্টিনিউড - ৭

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152554053481891>)

কম্পিউটার সায়েন্সে আন্ডারগ্রেড বা প্রোগ্রামিং এক্সপেরিয়েন্স না থাকায়, নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্সের হেড মৌখিকভাবে একবার, দুইবার, তিনবার, এডমিশন না দিয়ে আমাকে ফিরিয়ে দিছিলেন। আমি তখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার্সে এক সেমিস্টার শেষে, ইন্টার্ন করতে করতে ধারণা করেছিলাম, প্রোগ্রামিং করা কুল আর জব পাওয়া অনেক ইজি।

বিকল্প পন্থা হিসেবে, আমার আইপিই এর এডভাইজারকে বলেছিলাম, সিএসই এর একটা কোর্স নিলে, রিসার্চে সুবিধা হবে। ৩০ সেকেন্ড চিন্তা করে উনি, না করে দিয়েছিলেন। সিএসই এর হেড এর কাছে আরো একবার বার যাবার পর, আমাকে বুঝিয়ে বল্লো, "শুনো, এডমিশন দিতে হলে একটা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন দেখতে হয়। অনেকের কম্পিউটার সায়েন্সের আন্ডারগ্রেড সহ ৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা আছে।" এইটার উত্তর আগে থেকেই মুখস্থ করে গেছি। আমি বললাম, "I know its hard but I don't think it's impossible. আমি আন্ডারগ্রেডের প্রোগ্রামিং কোর্সে A+ পাইছিলাম। নেক্সট সেমিস্টারে, সিএসই এর দুইটা কোর্স নিতে চাই। যদি দুইটাতেই A পাই, তাইলে কি এডমিশন দিবা?" উনি বল্লেন, "I will try. However, your background won't qualify for teaching assistance or research position." তারমানে, এডমিশন যদি দেয়ও, স্কলারশিপ(ফান্ড) দিবে না।

---

এডমিশন পাইতে পারি, সেই খুশিতে, বগল বাজাতে বাজাতে, কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট এর বিল্ডিং থেকে বের হয়ে, বাসে উঠতে না উঠতেই মনে হইলো, আইপিই এর এডভাইজার সিএসই কোর্স নেয়ার কথা আগেই না করে দিছে। এখন, এডভাইজারকে না জানিয়ে কোর্স নিলে, রিস্ক হচ্ছে, আমার আইপিই এর স্কলারশীপ ক্যানসেল করে, এমনকি, দেশে ফেরত পাঠাতে পারে। তাই অলমোস্ট কাউকে না জানিয়ে, নিজে নিজে দুইটা সিএসই এর কোর্স রেজিস্ট্রেশন করে, চুপি চুপি, চোরের মতো সিএসই এর ক্লাসে যেতাম। জানি, এডভাইজার চাইলে, যেকোন মুহুর্তে আমার রেজিস্ট্রেশন চেক করতে পারে। কিন্তু তারচাইতেও বড় ভয় ছিলো, যদি এডমিশন পাইও, ফ্যামিলি থেকে খরচ নেয়ার কোন অপশনতো নাই ই বরং প্রতিমাসে কমপক্ষে ৪০০ ডলার দেশে পাঠাবো কিভাবে?

লাইব্রেরি, বুকস্টোর, ক্যাম্পাসের নিউজ-পেপারসহ অনেক জায়গায় জবের ট্রাই করলাম, লাভ হইলো না। তারপরে শুনলাম, ইনফরমেশন টেকনোলজি সার্ভিস (ITS) এ হেল্প ডেস্ক কনসাল্টেন্ট হিসেবে কাজ পাওয়া গেলে, মাস্টার্সে টিউশন ফি মাফ পাওয়া যাবে। হেল্প ডেস্কের কাজ হচ্ছে, ক্যাম্পাসের কোন কম্পিউটার বা কারো ল্যাপটপে সামান্য সমস্যা হইলে, ঠিক করা। এই পজিশনগুলা অনেক অনেক কম্পিটিটিভ এবং নর্থ ইন্ডিয়ানরা চ্যানেল ধরে ঢুকে যায়। জান-প্রাণ দিয়ে, ইন্ডিয়ানদের পিছনে ঘুরে, ফার্স্ট রাউন্ড পার হয়ে, সেকেন্ড রাউন্ডে রিজেকশন খাইলাম। তার উপরে প্যারা হচ্ছে, একবার রিজেক্ট করলে, এক বছরে আর ইন্টারভিউতে ডাকে না। এখন কি করি?

---

এরে ওরে ধরে, খুঁজে খুঁজে বের করলাম, ইনফরমেশন টেকনোলজি সার্ভিস (ITS) এর একটা অংশ, Technology Learning & Media Center (TLMC), যেখানে, স্টুডেন্টরা তাদের ক্লাস প্রজেক্ট, এসাইনমেন্ট, প্রোগ্রামিং রিলেটেড প্রবলেম নিয়ে আসে। TLMC তে যারা কাজ করে তারা অলমোস্ট সবাই কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট। ঐখানে গিয়ে বসে থাকতাম। ঐখানে যারা জব করে, তারা কিভাবে হেল্প করে দেখতাম। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। ঐখানেই বসেই আমার ক্লাসের পড়া, এসাইনমেন্ট করতাম। TLMC তে যারা কাজ করে, তারা স্টুডেন্ট এবং ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়ীদের জন্য প্রতি সেমিস্টারে কয়েকটা ওয়ার্কশপ অফার করতো - থিসিস রাইটিং, গুগল ওয়েবসাইট, এডভান্স এক্সেল, ইত্যাদি। এখন সমস্যা হচ্ছে, এডোবি ইলাস্ট্রেটর আর এডোবি ইন-ডিজাইন শিখাবে এমন কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও এই দুইটার কোনটাই আমি পারি না তারপরেও রিস্ক নিয়ে বললাম, TLMC তে যারা কাজ করে না, তারা কি ইন্সট্রাকটর হতে পারবে? TLMC এর হেড যে ছিলো, ও বললো, দেখি। টানা দুই সপ্তাহ অনলাইনে ভিডিও দেখে দেখে এডোবি ইলাস্ট্রেটর শিখে, ডেমো দেখানোর পরে, আমাকে ওয়ার্কশপটাতে শিখানোর দায়িত্ব দিছিলো।

--

এইদিকে, যেই দুইটা সিএসই এর কোর্স নিছি, ঐ দুইটার ক্লাসে গিয়ে, হাবলা কান্তের মতো বসে থাকি, মাথা মুণ্ডু কিচ্ছু বুঝি না। ক্লাস শেষে, এর কাছে যাই, ওর কাছে যাই, গুগল করি। তার উপ্রে আবার আইপিই এর ২টা কোর্স, রিসার্চের কাজ। আট ঘন্টা থেকে ঘুম চার-পাচ ঘন্টায় কমিয়ে, আড্ডা বাজি-দাওয়াত, ফেইসবুক বন্ধ করে, জীবন মরণ সাধনা চালাতে থাকলাম। ভাগ্য খুব সহায় থাকায়, মিডটার্মে দুইটা কোর্সেই ৯০ এর উপরে রাখতে পেরে, সিএসই ডিপার্টমেন্টের হেডের কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে এডমিশন দাও। উনি বল্লো, গ্রেডতো এখনো আসে নাই। সেমিস্টার শেষ হয় নাই। আমি বললাম, রেজাল্ট পাবলিশ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে আমি নেক্সট সেমিস্টার ধরতে পারবো না, তুমি একটু কষ্ট করে, টিচারদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নাও। ক্লাসের টিচাররা বলছে, আমি অনেক হার্ডওয়ার্কিং এবং ডেডিকেটেড। স্বপ্নের এডমিশন পেয়ে গেলাম। Fargo এর দুই বড় ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করে নিজের একাউন্টে ঢুকিয়ে, I-20 (অফিসিয়াল এডমিশনের কাগজ) বের করছি। কিন্তু টিউশন ফি এর কি হবে?

---

এডোবি ইলাস্ট্রেটর ওয়ার্কশপে, মাত্র দুইজন শিখতে এসেছিলো। আরো দুইটা ওয়ার্কশপে, ভলান্টিয়ার হিসেবে ছিলাম। এরপরে, TLMC তে আমি জব না করলেও, কোন স্টুডেন্ট আসলে, চান্সে একটু আধটু হেল্প করতাম। ঐখানে যেসব ভারতীয় ছিলো তাদের সাথে খাতির শুরু হইলো। নভেম্বরের লাস্টের দিকে, একজন পাশ করে, ভার্সিটি ছেড়ে চলে যাবে শুনে, TLMC এর হেড কে রিকোয়েস্ট করে, হালকা সিস্টেম করে, একই সেমিস্টারের রিজেকশনকে পাশ কাটিয়ে, আবারো ইন্টারভিউ দিছিলাম। এইবার রিজেকশনের এফেকশন কাঠিয়ে জবের অফার পাইছি। মাসে ৭২০ ডলার এবং টিউশন ফি মাফ। ঐদিন ছিলো আমার জীবনের অন্যতম খুশির দিন। ডিসেম্বর ১৬, ২০১০ এ আমি TLMC তে অফিসিয়ালি কাজ করা শুরু করি। তার দুই সপ্তাহ পরে, আইপিই এর মাস্টার্স ক্যানসেল করে, মনে মনে ভেবেছি, এইবার স্বপ্নের দরজা খুলে গেছে। আসলে যে, অথৈ সাগরে পড়েছি, সেটা বুঝতে বেশি দিন লাগেনি।

January 16, 2015 ইউ হ্যাভ টু ডু ইট - ২

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152488058156891>)

কয়দিন আগে এরাম একটা ইমেইল পাইছিলাম - "আমি HSC '14 ব্যাচ এর ছাত্র। আমি প্রথমে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় কোচিং এ ভরতি হয়েছিলাম। মাঝে আর্মি তে টিকে যাই আর Issb এর জন্য নির্বাচিত হই। ISSB তে ৪ দিনের মধ্যে আমার ভাইবা খারাপ হয় আর আমি ফাইনাল সিলেকশন এ বাদ পরি। এদিকে বাসায় এসে আমি জন্ডিসে আক্রান্ত হই আর এজন্য কোচিং এ যেতে পারিনি। সুস্থ হবার পর সব বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। হয়তো উতসাহ হারিয়ে ফেলায় পরীক্ষা খারাপ দিতে থাকি। সবায় বলে, ভাগ্যে নেই। বাবা মার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব কস্ট হয়। আমি একমাত্র ছেলে।মা ইদানিং খুব অসুস্থ। কোথাও ভরতি হতে পারিনি। কাজে আগের মত আর উদ্যম পাচ্ছি না স্যার।বাবা মা অনেক আশা নিয়ে ঢাকা পাঠিয়েছিল। বাসায় প্রতি মুহূর্ত অসস্তি তে ভুগি।"

আমার উত্তর -

এইসব ক্ষেত্রে, আব্বু-আম্মুর মন খারাপ, গার্লফ্রেন্ডের মুখ ভার, অন্যদের টিটকারি বা এড়িয়ে চলা, ফোনের রিপ্লাই না পাওয়া, জন্ডিস, কোনটাই কোনো ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছেন আপনি। আপনি ভর্তি হইতে পারেন নাই, আপনার উদ্যম, উৎসাহ কমে গেছে। না, এইভাবে বলবেন না। বরং বলেন, স্বীকার করেন, আপনি আপনার উদ্যম কমাইছেন। কমে যেতে দিছেন। আপনি ISSB তে চারদিনে বাদ পড়ছেন, সেটা নেগেটিভলি দেখছেন। কিন্তু চারদিন পর্যন্ত যে যেতে পারছেন, সেটা পজিটিভলি দেখেন নাই। সেটা আপনার ভুল হইছে। যেখানে, আপনার চিন্তা করা উচিত ছিলো, আমি যেহেতু চারদিন পর্যন্ত যাইতে পারছি, আমি ভর্তি পরীক্ষাতে ও পারবো। আপনি সেটা করেন নাই। সেটা আপনার দায়। সেই দায় স্বীকার করেন। পাশ কাটানোর চেষ্টা করবেন না।   
.  
.  
তবে, এখনো ভেবে দেখলে, পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে যাওয়ার অনেক কারণ আছে, আপনি জাস্ট সেগুলারে পজিটিভলি দেখার চেষ্টা করেন। আপনি হালকা হইলেও ভর্তি পরীক্ষার প্রিপারেশন নিছেন এবং কয়েকটাতে ভর্তি পরীক্ষাও দিছেন। তারমানে, আপনি জানেন কি টাইপের প্রশ্ন হয়। পরীক্ষা কেমন হয়। আবার পরেরবার যারা ফ্রেশ বের হয়ে আসবে তাদের চাইতে আপনি ভর্তি পরীক্ষার প্রিপারেশন নিতে বেশি সময় পাচ্ছেন। ওরা যেগুলা এখন নতুন করে শিখতেছে, আপনি অলরেডি সেগুলা পড়ে ফেলছেন। ভর্তি পরীক্ষার আগে হালকা রিভাইজ ও দিছেন।   
.  
.  
বি কেয়ারফুল। বাস্তবতা হচ্ছে, অনেক অনেক, আমার মনে হয় ৯৫% পোলাপান সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দিতে গেলে, লাড্ডু মারে।   
.  
.  
কেনো মারে, সেটার কারণ খুবই সিম্পল। লম্বা সময় পাইলে, শুরু করতে করতেই অনেক দিন চলে যায়। একদিন পড়লে, পাচ দিন খবর থাকে না। দেড় দুই মাস গেলে মনে হয়, পরের সপ্তাহ থেকে একদম নতুন ভাবে শুরু করবো। দুই দিন পরে সেটাও ঠিকে না। এইভাবে টাইম চলে যায়। ধীরে ধীরে একটা ভয় মনের মধ্যে ঢুকে যায়। এইবার যদি না পারি। এইবারই তো শেষ চান্স। সেই ভয়ের কারণে পড়তে বসলে মন টিকে না। কোচিং এ ভর্তি হইলেও, কারেন্ট ব্যাচের পোলাপানের সাথে মিলায় নিতে লজ্জা লাগে এবং ফলশ্রুতিতে, আগের চাইতে খারাপ কন্ডিশনে পড়ে যান। ভিতরে ফ্রাসস্টেশনের সাইজ ক্রমশই বাড়তে থাকে।   
.  
.  
দেখেন, নতুন যারা পাশ করবে। তারা যদি এইবার পড়ে চান্স পাইতে পারে। আপনি কেনো পাবেন না ? আপনারেতো আর ব্রিজের তলা থেকে কুড়ায় আনে নাই।   
.  
.  
সো, আপনাকে প্রিটেন্ড করতে হবে। নিজে নিজে ঠিক করতে, এক মাস পরে ভর্তি পরীক্ষা। প্রতিমাসের ২৮ তারিখ পরীক্ষা। এখন আর বেশি দিন সময় নাই। তাই, চার সপ্তাহের মধ্যে প্রিপারেশন নিতে হবে। দ্রুত বই খাতা বের করে প্রিপারেশন নেয়া শুরু করে দেন। একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সব সাবজেক্টের কিন্তু প্রিপারেশন নিতে হবে। হয়তো জানুয়ারি মাসের যেই ভর্তি পরীক্ষা (আপনি নিজে নিজে ঠিক করেছেন), সেটার জন্য ফিজিক্সের সব চ্যাপ্টার ভাজা ভাজা করতে যাবেন না। খালি ফার্স্ট পেপারের প্রথম দশ চ্যাপ্টার। পরের মাসে, প্রথম পত্রের বাকি চ্যাপ্টার। এইভাবে যদি নিজেরে বোকা বানিয়ে বানিয়ে, কৃত্রিম প্রেশার তৈরি করতে পারলে, দুই মাস পরে নিজেই টের পাবেন, কতটুকু পরিবর্তন হইছে। কনফিডেন্স লেভেল হাই হয়ে গেছে। আপনার আব্বুর মনের কষ্ট, আম্মুর মুখের হাসি নিয়ে টেনশন করা লাগবে না। যদি সেটা ফিরিয়ে আনার হেডম থাকে, একদিন ঠিকই ফেরত আনতে পারবেন, আপনার কাজের দ্বারা। চিন্তা বা হতাশা করে, শুধু উনাদের যন্ত্রণা আরো বাড়াবেন। আর কোন লাভ হবে না।

January 4, 2015 স্ট্রাগল, টু বি কন্টিনিউড - ৬

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152464937701891>)

USA তে সামার ইন্টার্ন বলতে, মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত, উনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের বাইরে কোন কোম্পানিতে, তিন মাসের জন্য জব করাকে বুঝায়। সামারে, সাধারণত কারো ক্লাস থাকে না, অনেকের ফান্ডও থাকে না। এই সময়ে ইন্টার্ন করলে, টু পাইস কামানো যায়, কিছু প্রফেশনাল এক্সপেরিয়েন্স হয়, যেটা দিয়ে ফুল টাইম জব পাইতে সুবিধা হয়। আমি জানুয়ারি ৩, ২০১০ এ নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি (NDSU) তে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং (IME) এ মাস্টার্স করতে আসি। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে ভার্সিটিতে একটা ক্যারিয়ার ফেয়ার হয়েছিলো। সেটাতে খুবই সিরিয়াসলি গেলেও, কোন ইন্টারভিউ এর কল পাইনি।

----

এপ্রিলের শুরুতে, এক ফ্যাকাল্টির ইমেইল অনুসারে, BTD Manufacturing এ রেজুমি জমা দিয়ে, ক্যাম্পাসে ইন্টারভিউর সুবাদে, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে, একটা ইমেইল পেলাম, "তোমারে ইন্টার্নের জন্য সিলেক্ট করে, দু-দুইবার ফোন দিয়েও, কোনো উত্তর না পেয়ে, শেষবারের মতো জানতে চাচ্ছি, তুমি ইন্টারেস্টেড আছ নাকি"। আম্রিকান সরকারের একটা রুল আছে, সামারে ইন্টার্ন করার পারমিশন (CPT) পাইতে হইলে, কমপক্ষে দুই সেমিস্টারের পড়াশুনা কমপ্লিট করা থাকতে হবে। আমি আসছি জানুয়ারিতে, মে মাস নাগাদ, আমার একটা মাত্র সেমিস্টার কমপ্লিট হবে। তারপরেও দেখিনা কি হয় ভেবে, BTD কে ইয়েস বলে দিছি। এখন কি করা যায়, তার বুদ্ধি বের করতে, বাংলাদেশী বড় ভাই, জব করে এমন কয়েকজন, কিছু ভারতীয়, অন্য ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র, ইন্টারন্যাশনাল অফিসের লোকজন, এমনকি USCIS এ ফোন করলেও, সব চেষ্টার একই আউটপুট, "অফ-ক্যাম্পাস ইন্টার্ন করতে পারবা না, অন-ক্যাম্পাস কিছু পাও কিনা দ্যাখো"। শেষমেষ, আমার এডভাইজার শুনে বল্লো, ইলিগাল কিছু করে ধরা খাইলে, ডাইরেক্ট এয়ারপোর্ট নিয়ে, ব্যাক টু দ্যা প্যাভিলিয়ন।

---

একটা সরকারী রুল মানে একটা বিশাল দেয়াল, একটা ফুল স্টপ, যার কথা শুনে হাত পা ছেড়ে দেয়াই স্বাভাবিক। শেষপর্যন্ত কি হবে বা কি করতে চাচ্ছি, যুক্তি দিয়ে কাউকে বুঝাতে না পারলেও, দেখিনা শেষপর্যন্ত কি হয় স্টাইলে এইটার পিছনে লেগে থাকলাম। উপান্তর খুঁজে না পাওয়ার মাঝেই, ওই কোম্পানি থেকে ইমেইল আসছে, মে মাসের ১৭ তে ইন্টার্ন শুরু হবে, তার আগে ১৩ তারিখে প্রোডাকশনের ভিপি, সবাইরে ফ্যাক্টরি দেখিয়ে, প্রজেক্ট বুঝায় দিবে। ঠিক করলাম, যাই হোক না কেনো, আগে ফ্যাক্টরিটা দেখে আসি। নিজের গাড়ি বা ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায়, অনেক কষ্টে, ফ্যাক্টরি দেখতে যাবার রাইড ম্যানেজ করি।

---

এর মাঝে, ডিপার্টমেন্টের VA Hospital রিসার্চ প্রজেক্টে, এক চিনকু রে, সামারে রিসার্চের জন্য হায়ার করা হইছে, যে পুরা সামারে, হসপিটালের ওয়ার্ক ফ্লো এনালাইসিস করে, প্রসেস ইমপ্রুভ করবে। সে অবজার্ভ করতে যাবে VA হসপিটালে, তারমানে কাজ করবে হসপিটালে কিন্তু রিপোর্ট করবে ডিপার্টমেন্টের প্রজেক্ট টিমরে আর তাকে বেতন দিবে ডিপার্টমেন্টের রিসার্চ ফান্ড। আমার মনে হইছে, এই টাইপের কিছু একটা BTD এর সাথে করলে, আমি ওদের ফ্যাক্টরিতে গেলেও, কাজ করবো ডিপার্টমেন্টের একটা প্রজেক্টের আন্ডারে, ডিপার্টমেন্ট আমাকে পে করবে, ব্যস ল্যাঠা চুকে যাবে। কিন্তু চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তিনটা - ১. কোম্পানিকে রাজি করাতে হবে ২. কোনো এক ফ্যাকাল্টিকে রাজি করাতে হবে ৩. এক সপ্তাহের কম সময়ে এইটা সিস্টেম করতে হবে।

---

ফ্যাক্টরি এবং প্রোডাকশন প্রসেস দেখে, বাংলাদেশে ইউনিলিভার, রহিমআফরোজে কনসালটেন্সির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, চামে তিনটা ফিডব্যাক দিয়ে, আমি যে প্রোডাকশন প্রসেস ইমপ্রুভ করতে পারি বুঝিয়ে দিয়ে, মিটিং শেষে, আমার সমস্যার কথা প্রোডাকশনের ভিপি কে বল্লাম। সে বল্লো, "আমি বলে দিচ্ছি, তুমি HR - এর কাছে যাও"। অনেক কষ্টে HR কে বুঝায়ছি, আমাকে ডাইরেক্ট পে না করে, NDSU এর IME ডিপার্টমেন্টের কোন ফ্যাকাল্টিরে আমার কাজের জন্য একটা প্রজেক্ট দিলে, ডিপার্টমেন্ট আমাকে পে করবে। সব-শুনে, HR জানতে চাইসে, কোন ফ্যাকাল্টি? এডভাইজার আগেই ভয় লাগাইছে, কোন উপান্তর না দেখে, হুট করে যে ফ্যাকাল্টি ইন্টারভিউ এর জন্য রেজুমি চাইছিলো, তার নাম বলে দিছি। অথচ ওই ফ্যাকাল্টি, এই ব্যাপারে, কিছুই জানে না।

---

বাসায় এসে, ভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে, ওই ফ্যাকাল্টির ফোন নাম্বার বের করে, ফোনে কনভিন্স করতে ব্যর্থ হয়ে, সারারাত ভেবে ভেবে, পরের দিন সকালে তার অফিসে গিয়ে, উনার আন্ডারে ইন্ডিভিজুয়াল স্টাডি নামে একটা কোর্স রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম। সামার প্রজেক্ট হিসেবে। সেটার এপ্রুভাল হিসেবে একটা ইমেইল নিয়ে, BTD তে যাওয়া শুরু করে দেয়ার পরেও, তিন-চার দিন পার হয়ে গেলেও, জানতাম না শেষপর্যন্ত কাজটা হবে কিনা। চাল্লু এক শ্রীলঙ্কান মেয়ে ইন্টার্ন, BTD তে যাওয়া আসার রাইড দেবার জন্য আরেক আম্রিকান ইন্টার্নকে রাজি করেছিলো, সপ্তাহে ২০ ডলার তেলের খরচ হিসেবে দিবে বলে। শ্রীলঙ্কান ঐ মেয়েকে দিয়ে তাকেও রাজি করিয়ে, আমি যাওয়া শুরু করেছিলাম। ফার্স্ট সপ্তাহের শুক্রবার বিকেলে, প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর এসে বললো, "গুড নিউজ হচ্ছে, IME ডিপার্টমেন্টের সাথে প্রজেক্ট ভার্বালি এপ্রোভ হইছে। ব্যাড নিজউ হচ্ছে, অফিসিয়ালি এপ্রুভ হইতে সামার শেষ হয়ে যেতে পারে, তার আগে তুমি টাকা পাবা না।"

---

অফিসিয়ালি ইন্টার্ন না করতে পারলেও, একটা সাকসেসফুল সামার শেষে, নিজেই নিজেকে অবাক করে দিয়েছি। এখন পিছন ফিরে তাকালে, সহজেই ডটগুলো কানেক্টেড হয়ে ভেসে উঠে। সব স্টেপগুলোই লজিক্যাল মনে হয়। কিন্তু আপনি যখন একটার পর একটা স্টেপ সামনে আগাতে চাইবেন, সামনের ডট দেখতে না পেয়ে, দেখবেন বাধার দেয়াল। আর আশেপাশের মানুষগুলো যুক্তি দিয়ে, পিছনে ছিটকে ফেলে দিতে চাইবে আপনাকে।

November 17, 2014 স্ট্রাগল, টু বি কন্টিনিউড - ৫

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152357150976891>)

ছোট বেলায়, সকালে মক্তব শেষে, গোসল করে, ভাত খেয়ে, জগে করে গরুর দুধ নিয়ে, স্কুলে যাওয়ার পথে, সাজুদার বাপের চায়ের দোকানে দুধ বিক্রি করে, স্কুল শেষে, ফিরার পথে, খালি জগ আর দুধের টাকা নিয়ে, বাসায় ফিরে, বিকেলে বাসায় টিচার কাছে পড়ার পরে, গরুর জন্য ঘাস কেটে, সেটা পুকুরে ধুয়ে, গরুর সামনে দিয়ে, মাগরীব পড়ে, সন্ধ্যায় পড়তে বসতাম। তাই ছোটবেলায় খেলাধুলা তেমন করা হয়নি। বছরে একদিন ঘাস কাটা ফাকি বা টিচার না আসলে, ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন খেলতে চাইলেও, ওরা আমাকে নিতো না। আমি একটুপরে আবার চলে যাবো বা আমার বোন এসে ডেকে নিয়ে যাবে দেখে। মাঝেমাঝেই, বাড়ির সামনের ক্ষেতের ডাটা শাক, কুমড়া, গাছের নারিকেল বিক্রি করতে বাজারে নিয়ে যেতাম। আম্মু শিখিয়ে দিতেন, এক জোড়া নারিকেলের দাম চাইতে হবে ২০ টাকা তবে কেউ ১৬ টাকা বল্লে দিয়ে দিতে হবে। আর সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসলে সেটা ১৪ টাকায় হলেও দিয়ে দিতে হবে।

---

বুয়েটে লেভেল-২ টার্ম-২ তে থাকা অবস্থায় একটা সাবজেক্ট ছিলো, সলিড মেকানিক্স। মেকানিকেলে সবচেয়ে বেশি যে কয়টা বিষয়ে ফেল করতো তাদের মধ্যে অন্যতম। ক্যামিকেল, এইপিই, মেটালার্জি ডিপার্টমেন্টেও এই সাবজেক্টে ফেলের অবস্থা মোটামুটি একই। ক্লাস টেস্টে গণ হারে শুন্য পেতো, পোলাপান। পরীক্ষার আগের প্রিপারেটরি লিভ এর সময় আমি আর শাকিল ভাবলাম সলিড মেকানিক্সের পুরা বইয়ের সব অঙ্ক সলভ করে ফেল্লে কেমন হয়। যেই কথা সেই কাজ। অলমোস্ট সব সলভ করে ফেল্লাম। তারপর ভাবলাম এইটা বিক্রি করা যায়। মোট ৯০ পাতা এর মত হইছিলো। কিন্তু পোলাপান কিনবে কেন? ওরাতো ৭০ বা ৮০ টাকা দিয়ে ফটোকপি করে ফেলতেই পারে। কি করবো বুঝতে পারতেছিলাম না। শেষমেষ বুদ্ধি বের করলাম, রঙিন এবং কালো কাগজে ফটোকপি করে, বাধাই করে বই আকারে বিক্রি করবো। তাইলে এই রঙ্গিন এবং কালো কাগজ থেকে অন্যরা ফটোকপি করতে পারবে না। কালি খেয়ে পুরাপাতা কালো হয়ে যাবে। ব্যস, বাধাই করে সেই বই বিক্রি করতাম ১৫০ টাকা আমাদের খরচ হইতো ৬৮ টাকা এর মতো। রুয়েট, কুয়েট, চুয়েটে এজেন্টও ছিলো। এজেন্ট বিক্রি করতো ১৭০ টাকায় আর আমাদের কাছ থেকে নগদে কিনে নিতো ১৫০ টাকায়। ৯০ পাতার একটা হাতে লেখা বই, মোটামুটি বাধ্য হয়ে ১৫০ বা ১৭০ টাকায় কিনে, ফটোকপি করতে না পেরে, পোলাপান রাতবিরাতে অশ্রাব্য ভাষায় কবিতা শোনাত। বুয়েট থেকে পাশ করার পরে উইসুফ বুক স্টোরে বইটা বিক্রি করে দেই ২০০৮ সালে। এই বছর দেশে গিয়ে শুনি এখনো সেই বই চলতেছে।

---

তার আগে, কলেজে, এনালগ ক্যামেরার (DSLR বা ডিজিটাল বা মোবাইল ক্যামেরার পূর্ব পুরুষ) ফিল্ম বিক্রি করে টু পাইস কামাইছিলাম। ইনভেস্টমেন্ট করছিলো কানা বাবু (শুভ্র এর মতো, মোটা পাওয়ারের চশমা ছিলো, তাই এই নাম) ঢাকা থেকে ফিল্ম কিনে, কলেজের হলে বিক্রি করছিলাম। একজনের বুদ্ধি মতে, পিকনিক এর দিনের জন্য ৫টা রেখে দিছিলাম। পিকনিক স্পটে ডিমান্ড ভেরি হাই ছিলো।

---

মিনিমাম দুইটা টিউশনিতো করতামই, মাঝে মধ্যে তিনটা বা চারটা। ভর্তি পরীক্ষার সিজনে ওমেকাতে ক্লাস নিতাম। ঢাকার বাইরেও যাইতাম ক্লাস নিতে। দুই বছর UCC তেও ক্লাস নিছিলাম।বাসা থেকে টাকা তো নিতামই না বরং ছোট ভাই বোনের খরচ সাপোর্ট দিতাম। কিন্তু এতো কিছুর মধ্যে পড়ালেখা ঠিক মতো করে যেতাম। আইপিই এর ৬ষ্ঠ ব্যাচ ছিলাম আমরা। এই ছয় ব্যাচের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথম জিপিএ ৪ এর মধ্যে ৪ পাই। আরো কয়েকবার পাইছিলাম। কম্বাইন্ড ফার্স্ট ছিলাম অনেক দিন। ২০০৭ এ গ্রামীণ ফোনের ডিজুসপ্রজেক্ট ডি ইয়ুথ কম্পিটিশনের ফাইনালে আমাদের টিম, "লব্ধি" ঢাকা উনিভার্সিটির এইবিএ এর "সব্যসাচি" টিম কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। সব নিউজ পেপার, টিভিতে সেই খবর, ডেইলি ষ্টার ক্যাম্পাসের মেইন নিউজ। এমনকি কয়েকটা বিলবোর্ডে ছিলো আমাদের ছবি। রুবাবাদ্দৌলা এর সাথে মিটিং ও করছিলাম সেই আমলে !!

---

লাস্ট সেমিস্টারের আগে, আমি, শাকিল আর কয়েকজনে মিলে ঠিক করলাম বিজনেস করবো। দিলাম কনসালটেন্সি ফার্ম, ECLECTIC নামে। কোন ইভেস্টমেন্ট ছাড়াই হল থেকে বিজনেস শুরু করে দিলাম। শেষ সেমিস্টারে দুইটা কাজও পেয়ে গেলাম। দুই পরীক্ষার গ্যাপে, চিটাগং গিয়ে প্রেজেন্টেশনও দিয়ে আসলাম। এইসব হাবিজাবি করতে গিয়ে লাস্ট সেমিস্টারে আমার রেজাল্ট সবচেয়ে খারাপ হয়। কম্বাইন্ড ফার্স্ট থেকে সেকেন্ড হয়ে যাই।একলাফে সিজিপিএ ৩.৯২ থেকে ৩.৮৭ নেমে গেছে। তারপরেও চাইলে বুয়েটের টিচার হইতে পারতাম সহজেই। কারণ থার্ড, ফোর্থ যারা ছিলো তারা টিচার হিসেবে জয়েন্ট করেছিলো। কিন্তু আমি করলাম না। কারণ, সোজা কাজটা সোজাভাবে করলে, আমি আর আমি থাক্লাম কেম্নে।

October 20, 2014 স্ট্রাগল, টু বি কন্টিনিউড - ৪

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152310877431891>)

ভর্তি পরীক্ষার পরে, ক্লাস শুরু হবার আগের সময়টায়, পোলাপানরা সাধারনত সদ্য গজিয়ে উঠা গোফটায় বার বার ক্ষুর চালিয়ে, সেটাকে তা দেয়ার জন্য উপযোগী করে তোলে। আমি ভাবলাম ক্ষুর না চালিয়ে বা এলাকায় পুরান টিউশনি খান আবার চালু না করে, ঢাকায় গিয়ে নতুন টিউশনি খুজতে পারি। অনেক টাকা দেয় শুনছিলাম। যেই কথা সেই কাজ, ঢাকায় এসে টিউশনি খুজতে থাকি। কয়েকটা টিউশনি মিডিয়াতে ট্রাই করেও কোন লাভ হয় না। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা মিলিয়ে আয়তনে কম হওয়ায়, বদনখানি দেখেই ডাইরেক্ট না করে দিছিলো এক গার্ডিয়ান। কয়েকদিন না যেতেই, আমি যেখানে ছিলাম, সেখানে নিছক ভুল বুঝাবুঝি থেকে আমাকে অভিযুক্ত করা হলো। নিজেকে নিঃদোষ প্রমান করতে ব্যর্থ হয়ে, কাউকে কিছু না জেনেই, পরেরদিন ভোরে জিনিসপত্র যা ছিলো সব নিয়ে, ঐ বাসা থেকে বের হয়ে যাই। এখন, কোটি মানুষের ঢাকা শহরে এই আমি থাকমু কোথায়?

---

মগবাজার গেলাম, কলেজের এক ফ্রেন্ডের, নাম ছিলো, পিচ্চি সেলিম (উচ্চতা কম বলে, এমন নাম)। কিন্তু তার ওখানে রাখতে পারবে না। আরো দুইজনের কাছে ট্রাই করেও লাভ হলো না। এলাকার এক আঙ্কেল চা খাইয়ে বিদেয় করে দিছিলো। সারাদিন পার করে, শেষমেষ, গ্রিন রোডে, IBA হোস্টেলের উল্টা পাশে, কাজিপাড়ায়, কাজির একটা বিশাল মেস ছিলো। সেই মেসের সামনে সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনের সাথে কথা বলে, ডাবলিং করে থাকার ব্যবস্থা করি। সে ফার্মগেটে একটা চশমার দোকানে কাজ করতো, আর আমাকে তার আত্নীয় পরিচয়ে থাকতে হবে। সেদিন কেনো যে, সে আমাকে বিশ্বাস করে ছিলো, আল্লাহ মালুম। খাবারের ব্যবস্থাও সে করে দিলো। ঐখানে সিস্টেম ছিলো, কাজের বুয়ারা ৮-১০ জনের একটা গ্রুপের জন্য একসাথে রান্না করতো এবং প্রত্যেক গ্রুপের রান্না থেকে, প্রতিবেলায় বুয়া নিজের জন্য খাবার পাইতো। সে এই রকম ৬/৭ গ্রুপের রান্না করতো এবং এক গ্রুপের খাবার সে নিজে খেয়ে বাকি খাবার বিক্রি করে দিতো। আমি ছিলাম সেই খাবারের কাস্টমার। সপ্তাহখানেক এইভাবে থেকেও টিউশনি যোগাড় করতে ব্যর্থ হই। পকেট মামা ইহকাল ত্যাগ করে করে অবস্থা। এখন কি করবো? গ্রামের বাড়িতে ফেরৎ যাবো?

---

মাথায় অন্য একটা আইডিয়া আসলো। চলে গেলাম টঙ্গীতে, আমার খালুর হার্ডওয়ার দোকানে। টঙ্গী মার্কেটের পিছনে, নোয়াখালী পট্টিতে। সেখানে তালা-চাবি, বালতি, ঝাড়ু, কনস্ট্রাকশনের জিনিস, যা যা আছে সব বিক্রি করতাম। হাত দিয়ে তারকাটা (nail), ১ কেজি বা ২ কেজির প্যাকটে ঢুকাতে গেলে, আঙ্গুলের নখের নিচে তারকাটার খোচা লেগে, একটু একটু চামড়া উঠে যেতো। পরে পানি লাগলে জ্বলতো। আলকাতরা, কেজি করে বিক্রি করতে গেলে, মাঝারি সাইজের ড্রাম থেকে থেকে ছোট ছোট মাটির পাতিলে ঢালা লাগতো। পরিমানে ঠিক না হলে কয়েকবার কম-বেশী করে এডজাস্ট করা লাগতো এবং প্রায়ই নেকড়া দিয়ে মুছতে গেলে হাতে লেগে যেতো। যতই সাবান দিয়ে ধুয়া হোক না কেনো, খাবারের সময় ঠিকই আলকাতরার গন্ধ টের পাওয়া যেতো। আর চটের লম্বা কার্পেট গজ হিসেবে বিক্রি করলে, মাপার জন্য নিয়ে যেতাম পাশের এতিমখানার ছাদে। চটের বস্তার পশমে ভরে যেতো পুরো শরীর।

---

সাধারনত শুক্রবারে বড় কাস্টমার আসতো। দোকানের সামনে তাদের ভ্যানগাড়ি দাড়ানো থাকতো। এক দেড়শো আইটেমের লিস্ট আগে থেকে ওরা বানিয়ে আনতো। আমাদের দোকানে না থাকলে অন্য দোকান থেকে এনে দিতাম। একটা একটা করে মেপে ওদের ভ্যানগাড়িতে উঠাতে হতো। এইসব করতে করতে অনেক সময় সন্ধ্যা হয়ে যেতো এবং সন্ধ্যার পরই আমাদের লাঞ্চ হতো। আর মাঝে মধ্যে, কাস্টমারের জন্য আনা সিঙ্গারা-চা বেচে গেলে আমরা খাইতাম।

---

অনেক সময় খালু গর্ব সহকারে লোকজনের সাথে গ্বল্প করতো, "ও বুয়েটে চান্স পাইছে"। আমার মনে হয় না, আমার দিকে তাকিয়ে কেউ বিশ্বাস করতো। আবার অতি উৎসাহি কেউ কেউ, বুয়েটের ভিসির নাম জিগ্গেস করতো এবং আমি উত্তর দিতে ব্যর্থ হতাম। তারা আরো বড় সন্দেহের চোখে তাকাতো। আবার কেউ কেউ চামে বলে দিতো, তার পাশের বাসার বাড়িওয়ালার চাচাতো ভাইয়ের মেয়ে বুয়েটে পড়ে।

September 26, 2014 স্ট্রাগল, টু বি কন্টিনিউড - ৩

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152261963926891>)

বুয়েটে, প্রথম যখন ক্লাস শুরু করি, তখন পোশাক হিসেবে কলেজের ড্রেসের একটা শার্ট, একটা প্যান্ট (কলেজ থেকে ফ্রি পাইছিলাম) তার সাথে দুইটা ফকিরা মার্কা জিন্স আর ৩/৪ টা টি শার্ট-ছিলো।

---

একদিন আবিষ্কার করলাম আমার বেডের নিচে একটা সুটকেস। আগে যে ভাইয়া ছিলেন, উনি রেখে গেছেন। প্রায় বছর দেড়েক ঐ ভাইয়ার কোনো খবর নাই। পরে শুনছি উনি চিটাংগ চলে গেছেন। আর সুটকেসে উনার দরকারী কিছু নাই। তারো কিছুদিন পরে, আমি আর আমার রুম্মেট রাকিশ ভাই মিলে সুটকেস খুললাম। দেখি ঐখানে অনেকগুলা শার্ট আছে, যেগুলা আমার সাইজের দেড় কি দুই গুন বড়। কিছু ক্যাসেট এবং একটা ক্যাসেট প্লেয়ার ছিলো (এখন জাদুঘরে দুই একটা থাকতে পারে)। প্রায়ই আমার পরিস্কার কিছু থাকতো না পড়ার উপযোগী (আলসেমি করে ধুইতাম না)। আর পারফিউম কিনে ব্যবহার করবো, সেই অবস্থা ছিলো না। হয়তো উচিত হয়নি, তারপরেও একদিন বাধ্য হয়ে, সুটকেস থেকে শার্ট বের করে পরা শুরু করলাম। শার্টগুলা এত বড় ছিলো যে, প্যান্টের ভিতর সাইড দিয়ে গুজিয়ে, হাতা ফোল্ড করলেও সোল্ডারের দিকে তাকালে বুঝা যেতো। সেটা দেখে আমার রুম্মেট (উনাকে আমরা কাকু নামে ডাকতাম, অনেক কারণে) হাসাহাসি করতো। এমনকি আমার ক্লাসের ফ্রেন্ডরাও সেটা নিয়া হাসাহাসি করতো। অত্তো বড় শার্ট। তুই একদিন বড় হবিই !!! সাথে সাথে আমিও হাসতাম। হাসি দেওয়া ছাড়া আমার আর কিবা করার ছিলো????

---

সেই ভাইয়ার ফেলে যাওয়া স্যান্ডেল আর জামা পরে আমি এক্স নটরডেমিয়ান, থার্ড ইয়ার মেকানিক্যাল সেজে ফাস্ট টিউশনি করাইছিলাম। দুইটাই ভূয়া তথ্য। এমনকি টিকাতলির মোড়ে, নটরডেমের এক স্টুডেন্টকে, এক্স নটরডেমিয়ান হিসেবে পড়ায়ছিলাম কিছু দিন। কিন্তু মিথ্যা কথা বলা বা ইনফরমেশন হাইড করতে ভালু লাগে না (সাধু!!!)। তাই কয়দিন পর, ভালো টিউশনি পেয়ে, ঐ টিউশনিগুলা অন্যদের দিয়া দিছিলাম। কি করমু, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার বললে কেউ টিউশনি দেয় না। সবাই খুঁজে ইলেকট্রিকাল আর সিএসসি উইথ এক্স নটরডেমিয়ান। অন্যদের খাওয়া নাই।

---

লেভেল ৩, টার্ম ১ (থার্ড ইয়ারে) উঠার পর। আমাদের ফার্স্ট ক্লাস প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। দেখা গেলো আমার কোনো ফর্মাল শার্ট, প্যান্ট বা জুতা নাই। কলেজ ড্রেসের সেই শার্ট আর প্যান্টখানি, কবেই ছিড়েছিড়ে তেনাতুনা হয়ে গেছে। আর এইদিকে টিউশনির বেতনও পাই নাই। আর টিউশনির বেতন দিয়ে হালকা ফ্যামিলী সাপোর্ট দেয়াও লাগতো। শেষমেষ, বন্ধু শাওনের কাছ থেকে ২০০ টাকা ধার করে, ঢাকা কলেজের উল্টা পাশ থেকে ১৫০ টাকা দামের, পলিস্টারের রেডিমেড প্যান্ট কিনে, শাওনের শার্ট, বন্ধু মোবারকের জুতা জোগাড় করতে পারলেও আমার পাতলি কোমড়ের বেল্ট ম্যানেজ করতে পারি নাই। তাই, প্রেজেন্টেশন দেবার সময় শার্ট, চারপাশ থেকে একটু বেশী নামায় দিছিলাম। কারণ, কোমরে যে বেল্ট নাই, সেই ব্যপারটা যাতে কেউ বুঝতে না পারে।

September 20, 2014 স্ট্রাগল, টু বি কন্টিনিউড - ২

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152251741166891>)

বহুকাল আগে, এসএসসি পরীক্ষায় ষ্টার মার্কস বাংলালিঙ্কের দামে পাওয়া যেতো। আইজকাইলকার চেংড়াপুলাপানের জিপিএ ৫ পাওয়ার মতো। কিন্তু আমি সেটা পাইনি। আমার এসএসসি এর রেজাল্ট ছিলো ফার্স্ট ডিভিশন-এক বিষয়ে লেটার। প্রিয় সাবজেক্ট, ফিজিক্স অবজেক্টিভে ১৬, আর ২/৩ মার্কস কম পাইলে ফেল করতাম। ১১০০ নম্বরের মধ্যে ৭৫০ নম্বর পাইলে তারে ষ্টার বলতো আর কোনো সাবজেক্টে ৮০ এর উপর পাইলে তারে লেটার বলতো। সেই রেজাল্ট দিয়ে নটরডেম কলেজ, ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ, ইনফ্যাক্ট ঢাকার মোটামুটি মানের কোন কলেজেরই ভর্তি পরীক্ষা দেয়া তো দূরে থাক, ভর্তির ফর্মই কিনতে পারলাম না। ছোটবেলায় খুব শখ ছিলো, ক্যাডেট কলেজে পড়ার। আর কিছু না হোক জিলা স্কুল বা থানার পাইলট স্কুলে। কোনোটাই হয়নি।

---

তাই, ফকফকা সাদা রংয়ের, ৪০ কেজির একটা চালের বস্তার ভিত্রে বই খাতা, জামা কাপড়, যা ছিলো সব ঢুকাইছি। পারলে আমি নিজেরেও ঢুকাইয়া ফেলি, এরাম অবস্থা। বস্তাটা মাথায় নিয়ে, ঢাকায়, মামার বাসার উল্টা দিকে রাস্তা পার হয়ে, বাসাটার দিকে আরেকবার তাকালাম। গ্রাম থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে আসা ছেলেটির নটরডেম কলেজে ভর্তি হবার স্বপ্নখানি ভেঙ্গেচুড়ে গিয়েও, গুড়াগুড়া অংশগুলা কেনো জানি বাতাসে দ্রবীভূত হতে পারতেছিলো না। গুড়িগুড়ি বৃষ্টির সাথে অস্ফুস্ট চোখের জল মিশিয়ে, সফেদ বস্তাখানরে কখনো মাথায়, কখনো বগলের তলে নিয়ে, ডাক মারা ব্যাটসম্যানের মতো, যাত্রা শুরু করলাম। ব্যাক টু দ্যা প্যাভিলিয়ন।

---

প্যাভিলিয়নে ফিরতে না ফিরতেই, শুভাকাঙ্ক্ষীরা গিজ গিজ করতে লাগলো। হেগো, খাইয়া দাইয়া কোন কাজ কাম নাই, খালি টিপ্পনি কাটে, অমুকে, বোম্বল মার্কা স্টুডেন্ট, রোল নং দশের বাইরে সেও ফার্স্ট ডিভিশন দুই বিষয়ে লেটার পাইছে। আগে শুনছিলাম, এ ভালো স্টুডেন্ট। এখন দেহি নষ্ট হয়ে গেছে গা। আফসোস। বাপে কত কষ্ট করে সংসার চালায়। ছেলেপুলে তার মর্ম বুঝলো না। আবার কেউ কেউ এসে ফ্রি বুদ্ধি দেয়, পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে উমুকে ফাঠালাইছে। আম্মু আর আপুরা মোটামুটি ডিসাইডেড, যে আমি আরেকবার পরীক্ষা দিচ্ছি। শুধু বাগড়া দিলেন আব্বু। বল্লো, "যে পারে, সে হোচট খেয়েই দাড়াতে পারে। আর যে পারে না, সে এক জায়গায় বার বার হোচট খায়।" তারপর আব্বুকে সবার প্রশ্ন, তাইলে এখন কোন কলেজে ভর্তি হবো? এইটার উত্তর কেউ জানে না।

---

আমার আপু আন্ডারগ্র্যাড করার টাইমে, হলে উনার পাশের রুমে এক আপু ছিলেন। উনি কুমিল্লার এক কলেজের নামে গ্বল্প করতেছিলেন, জুরানপুর টাইপের কিছু একটা নাম হবে। কিন্তু ঐটা কোন জায়গায়, তা আমার আপু জানে না। আমি উঠলাম পাবলিক বাসে, কলেজ খোঁজার জন্য। একজন বলল যাত্রাবাড়িতে, জুরাইন নামে একটা জায়গা আছে। কিন্তু ঐখানে গেলাম না। কারণ, আপু বলছে, কলেজ কুমিল্লায়। বাসের মধ্যে একে-ওকে জিগ্যেস করি। কোন লাভ হয় না। শেষমেশ এসে নামলাম, কুমিল্লা বিশ্বরোডে। ঐখানে অনেক জনরে জিগ্যেস করার পর, লাস্টে এক ট্রাফিক পুলিশ বল্লো, গৌরীপুরের দিকে এরাম একখান কলেজ আছে কিন্তু ঐদিকে এখন বন্যা হচ্ছে। আর যাইতে হইলে এইখান থেকে কুমিল্লা ক্যান্টরমেন্ট যান, তারপরে পাপিয়া বাস। বাসের মধ্যে আবার জিগ্যেস করতে থাকলাম। শেষমেশ গৌরীপুর নামার পর একজন বল্লো, একটা কলেজ আছে জুরানপুর কিন্তু ঐখানে পানি। যাওয়া যাবে না। কিন্তু আমি ফিরে যাবার পাত্র না। দর্কার হইলে সাঁতরিয়ে যাবো। যদিও সাঁতার ভালো পারিনা। আগাইতে আগাইতে শহীদনগর এসে নামলাম। তারপর টেম্পুতে করে ৪টার দিকে গিয়ে কলেজে পৌছলাম। অজপাড়ার মাঝে হইলেও জায়গাটা বেসম্ভব সুন্দর। একজন মেজর জেনারেল কলেজটা করছে। কলেজে গিয়ে, ভর্তির ফর্ম চাইলাম, কিন্তু আমারে দিবে না। কারণ সায়েন্সে মিনিমাম ষ্টার মার্কস, এইখানেও। আমারে বল্লো তুমি আর্টস বা কমার্সের ফর্ম নিতে পারো। কিন্তু সায়েন্সের হবে না। মাথায় হাত। অলমোস্ট অফিসের সামনে ফ্লোরে বসে পড়তে নিছিলাম। এখন বাসায় ফিরে গেলে আবার আমাকে এসএসসি পরীক্ষা দিতে হবে।

---

আমি আবেগে নয়, হতাশায় আর ব্যর্থতায় কাইন্দালছি টাইপ অবস্থা। এই সময় রান্ডম একজন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লো, "কি হইছে, তোমার?" বল্লাম, আমাকে ফর্ম দিচ্ছে না। উনি সব শুনে বল্লো, ষ্টার মার্কস এর নিচে তো ফর্ম দেয়া হবে না। সেটাই নিয়ম। আমি বল্লাম, স্যার আমি ভালো স্টুডেন্ট। সামহাউ রেজাল্ট খারাপ হইসে। উনি আমাকে টিচারদের রুমে নিয়ে, কেমিস্ট্রি স্যার, এনামুল হকের কাছে নিয়ে গেলেন। এনামুল হক স্যার আমাকে পানির রাসায়নিক সংকেত জিগ্যেস করলেন। আমি, বল্লাম পানির সংকেত, H2O আর ভারী পানির সংকেত D2O। উনি বল্লেন বাহ তুমি ভারী পানির সংকেত জানো। উনি আরো কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। তারপর ঐখানে ফিজিক্স স্যার ছিলেন, উনিও কিছু প্রশ্ন করছিলেন। আরো কয়েকজনের প্রশ্নের উত্তর দেবার পর। ঐ যিনি আমাকে টিচার্স রুমে আনছেন। পরে জেনেছি উনার নাম, শাহ আলম স্যার। উনি প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে নিয়ে গেলেন। প্রিন্সিপাল স্যার আমাকে ইংরেজি কিছু ট্রান্সলেশন জিগ্যেস করলেন, মোস্টলি প্রবাদবাক্য। আমি উত্তর দিলাম। উনি শেষ পর্যন্ত আমাকে একটা ফর্ম দিলেন। যদি আমি ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ তে ৭০ এর উপর নম্বর পাই তাইলে আমাকে ভর্তি করাবে। কয়েক সপ্তাহ পরে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে, ঐদিনের ভর্তি পরীক্ষার ঝড়ে খালি বক না, হাতি ভল্লুক ছানাও মরে গিয়ে, আমি ফার্স্ট হয়ে গেলাম।

---

জুরানপুর কলেজে, সেই ব্যাচে, এসএসসিতে ৮৮১ নম্বর পাওয়া পোলাপানও ছিলো। ৮৪০ এর উপরে ছিল ১৯ জন। আমার ছিলো ৭২৭ মার্কস। আমার ব্যাচে এসএসসি এর নম্বরে, আমি লাস্ট থেকে দ্বিতীয়। প্রথম ক্লাস টেস্টে, ফিজিক্সে ১০ এ পাইছি ৩। আমার সমান আর একজন পাইছিলো। ম্যাক্সিমাম পোলপান পাইছে ১০ বা ৯। প্রচুর ট্যালেন্টেড পোলাপান ছিলো। আমার আশেপাশেই কমপক্ষে ৮/১০ ছিলো। কিন্তু পরিশ্রম, সাধনা, হাল্কা আনসোসাল হয়ে মাস্তির পরিমান কমিয়ে, বিকেলে ঘুরতে বের না হয়ে পড়তাম। শেষপর্যন্ত, আমি ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, এমনকি টেস্টে ফার্স্ট ছিলাম। ফাস্ট ইয়ার ফাইনালে, ফিজিক্সে ৭৫ এ ৭৪ পাই। সেই শাহ আলম স্যার, আমাকে ফ্রি প্রাইভেট পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। একটা টিউশনিও জোগাড় করে দিছিলেন। হলের মধ্যে থাকা-খাওয়া, কলেজের বেতন, এমনকি বইও ফ্রি পাইছিলাম। পুরো ইন্টারমিডিয়েট পড়তে বাসা থেকে সর্বমোট ৩২০০ টাকা নেওয়া লাগছে। অথচ সেই শাহ আলম স্যারকে, অথবা কেমিস্ট্রির এনামুল হক স্যার, ম্যাথের রইস স্যার, ফিজিক্সের পাটোয়ারী স্যার বা বাংলার মুনিরুজ্জামান স্যারকে থাঙ্কু বলা হয় নাই এখনো।

---

জানি, ধন্যবাদের পাবার আশায় দেশের লাখ লাখ টিচার হা করে বসে থাকেন না। শুধু জ্ঞানের আলো দিয়ে উনারা হাতি ঘোড়া তৈরী করেন না। মাঝে মধ্যে, আমার মতো মশা মাছিরে থাপ্পর না দিয়ে, একটু রক্ত খাইতে দিয়ে, আলোর পথ দেখান। তাই, একদিন সামনে দাড়িয়ে বলতে হবে, থাঙ্কু, ফর হেল্পিং এ রান্ডম কিড।

September 6, 2014 স্ট্রাগল, টু বি কন্টিনিউড

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152228487221891>)

বহুকাল আগে, সেলফি, ল্যাপটপ এমনকি মোবাইলের যুগেরও আগে। আমি থাকতাম কুড়িল বিশ্বরোড, ফ্রেন্ডের বাবার টিন শেড এ। ঐ টিন শেড এ ৬টা রুম ছিলো। সেখানে ৫টি রুমে, ৫টি ফ্যমিলি থাকতো আর কোনার একটা রুমে থাকতাম আমি আর আমার ফ্রেন্ড। আমি কোচিং করতাম ওমেকাতে ও করতো UCC তে ।

---

একদিন এমন অবস্থা দাড়াইছে যে, বিশ্বরোড থেকে ফার্মগেট কোচিং এ যাওয়া-আসার মত টোটাল ছয় টাকা তো দূর কি বাত, আমার কাছে এক টাকাও নাই। টাকা চাহিয়া পিতার নিকট পুত্রের পাঠানো পত্রের জবাব বা অর্থ এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। স্টেটাস আপডেট নেবার কোনোরূপ উপান্তর নাই। আশেপাশের চার ফ্যামিলির কাছ থেকে টাকা ধার করা শেষ। বাকি এক ফ্যমিলি নিজেরাই ভিক্ষা করে চলে। আমি গিয়ে টাকা ধার চাইতে পারি কিনা, বুঝতে পারতেছিলাম না। এমতাবস্তায়, আমি বাসায় বসে, বাপের উপর মন খারাপ করতে পারতাম, ভাগ্যরে গালি দিতে পারতাম। কিংবা বিশ্বরোডের উপরে রঙিন টিভির শোরুমের কাঁচের বাইরে দাড়িয়ে ক্রিকেট খেলা দেখতে পারতাম। অথবা দুপুরে কি খাবো সেটা নিয়ে চান্দি গরম করতে পারতাম। টেনশনে নিজের আঙ্গুলের নখ দাত দিয়ে কেটে কেটে ছিড়তে পারতাম।

---

শেষমেষ এইসব কিছু না করে, কুড়িল বিশ্বরোড গিয়ে ৩ নম্বর বাসে গিয়ে উঠে দাড়ালাম। বনানী আসার পর কন্টেকটার ভাড়া চাইতেই, পিছনের পকেটে হাত দিয়ে, ভাব ধরে বল্লাম, "মামা, ভুলে মানিব্যাগ বাসায় ফেলে এসেছি" কন্টেকটারের দিলে দয়া হলো, আমারে ছেড়ে দিলো। অথচ ওই আমলে আমার মানি ব্যাগই ছিলো না। আর ফিরার পথে ফার্মগেট থেকে উঠে একই কাহিনী করার পর, কন্টেকটার, ভাড়া নাই দেইখ্যা আমারে মহাখালি নামায় দিছে। ভীষণ ভীষণ মন খারাপ হইছিলো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয় হয় অবস্থা, পেটে দানাপানি পড়ে নাই। রেল ক্রসিং এর ওই খানে বসে ছিলাম প্রায় ২০-২৫ মিনিট। হেটেই বিশ্বরোড যাবো কিনা, ভাবতেছিলাম। বিপদের সময়, আমার আবার বুদ্ধি হ্যাং হয়ে যায়। তাই, রেল লাইনের ধারে বসে, কোচিং এর দেয়া লেকচারশিট খুলে দেখলাম কিছুক্ষণ। আবার সাহস করে আরেকটা বাসে উঠে দাড়ালাম, একই সিস্টেমে মানি ব্যাগ ভুলে গেছি স্টাইলে, ভাড়া ছাড়াই শেষমেষ কুড়িল পৌঁছে গেলাম।

---

আর কোনো উপায় না দেখে, ফ্রেন্ডের চাচীর কাছে গিয়ে অনুনয় বিনয় করে ১০০ টাকা ধার চাইলাম। ফ্রেন্ডের বাসার একটু দুরেই ফ্রেন্ডের চাচার বাসা ছিল। ওই ১০০ টাকা ধার পাওয়া ছিলো, আমার কাছে লটারি পাওয়ার মতো। হয়তো আমার ক্ষুধাতুর মুখের দিকে তাকিয়ে উনার দয়া হয়েছিলো। কয়েকদিন আমার লাঞ্চ ছিলো, ফার্মগেটের কোনায় সিড়ির নিচে, ছোট্ট একটা কনফেকশনারী দোকানে। সেটায় এক টাকা দামের একটা সিঙ্গারা পাওয়া যেতো। নর্মাল সিঙ্গারা। কলিজা সিঙ্গারার দাম ছিলো দুই টাকা। আর ঐখানে পানি খাইতাম না। একগ্লাস ফিল্টার পানির দাম ছিলো এক টাকা। তাই ওইখান সিঙ্গারা খেয়ে, হেটে এসে, ওমেকাতে পানি খাইতাম দুই কি তিন গ্লাস।

---

ওমেকার মিজান ভাইয়ের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক কৃতজ্ঞ। ৩৫০০ টাকা কোচিং ফি এর ১৫০০ টাকা তিন কিস্তিতে দিছিলাম। আর বুয়েটে চান্স পেয়ে, টিউশনি করে, এক বছর পরে, বাকি দুই হাজার ধার শোধ দিছিলাম।

---